সুমন্ত আসলাম

কে তুমি

SUPERIOR SUNY

BOILOVERS.COM

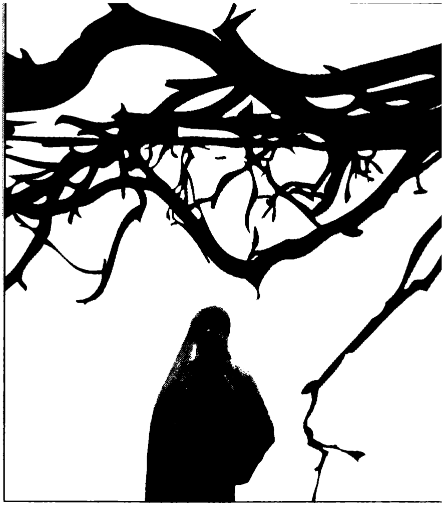

কথাটা আমি প্রায়ই শুনি, সাধারণত ঘুমানোর আগে শুনি। কিন্তু কথাটা কে বলে তাকে দেখতে পাই না। এদিক-ওদিক তাকাই, আশপাশে খুঁজি, কোথাও তাকে দেখা যায় না।

মাঝে মাঝে মেঝেতে তার হাঁটার শব্দ শোনা যায়— খস খস..., খস খস...। সে যে আমার চারপাশে চলাফেরা করে সেটা বুঝতে পারি, কেবল বুঝতে পারি না কে এভাবে হাঁটে, কে আমাকে এভাবে অদৃশ্যভাবে ঘিরে রাখে অবিরত!

কিছুদিন পর বুঝতে পারি নিপাও কেমন যেন করে। রাত হলেই কেমন যেন পাল্টে যায় ও। ঘুমের মাঝে হাসতে থাকে কিন্তু হাসিটা কেমন যেন অন্যরকম মনে হয়, রহস্যময় হাসি। রাত হলে পাল্টে যায় আমাদের ছোট কাজের মেয়েটাও। হঠাৎ-হঠাৎ তার কাছে এক-একটা পুতুল চলে আসে, লাল-নীল পুতুল, ছোট-বড় পুতুল, কিন্তু কোথা থেকে আসে কেউ জানে না।

পাশের ফ্ল্যাটের মোর্শেদ সাহেব আর তার স্ত্রীর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুও আমাদের এই বাসাটা। তারা নাকি রাত-বিরাতে কী দেখতে পান আমাদের বাসার বারান্দায়! সারারাত ভরে তারা তা দেখার চেষ্টা করেন।

সুমার মাধ্যমে অবশেষে আমার পরিচয় হায়াৎ রাস্তি নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। আধপাগলা অথচ ভীষণ সচেতন এই মানুষটা সবকিছুর সমাধান করে ফেলেন এক সময়। তারপরও আমি সেই কথাটা শুনতে পাই। আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলা সেই কথাটা শুনে আমি প্রায়ই চিৎকার করে বলি— কে তুমি, কে তুমি? কেউ কোনো উত্তর দেয় না। সারারাত নির্ঘুম কেটে যায় আমার।

প্রচ্ছদ :: মাসুম রহমান

কে তুমি

সুমন্ত আসলাম

অন্যপ্রকাশ

পঞ্চম মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৯
চতুর্থ মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৯
তৃতীয় মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৯
প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০০৯

© | লেখক

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৬৮১

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ১২০ টাকা

আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

কানাডা পরিবেশক | এটিএন বুক এন্ড ক্রাফটস
২৯৭০ ড্যানফোর্থ এভিনিউ, টরেন্টো

K Tumi | Sumanto Aslam
Published by Mazharul Islam
Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk. 120.00 only
ISBN : 984 868 508 1

মানুষটার কথা আমি অনেকের কাছেই শুনেছি। সাধারণত কারো অনুপস্থিতিতে কিংবা আড়ালে-আবডালে কথা বললে নেতিবাচক কথা বলে মানুষ। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে সবসময় আশাব্যঞ্জক কথা শুনেছি আমি। ভালো লেগেছে আমার, প্রচণ্ড ভালো। যাক, দেশে আশাজাগানিয়া মানুষ এখনো আছেন!

প্রিয় সাগর ভাই, প্রিয় ফরিদুর রেজা সাগর ভাই

আপনার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয় নি। নিশ্চয় একদিন দেখা হবে। দেখা হলে বলব— সবাই তো আশার কথা বলে, কিন্তু আশাটা জাগিয়ে তুলতে পারে কে? আপনি পারেন। স্রষ্টা আপনাকে সেই ক্ষমতাটা দিয়েছেন!

‘এমন কিছু অশ্রু থাকে যা কখনও যায় না ঝরে
এমন কিছু ভালো লাগা থাকে যা কখনও যায় না মরে।
এমন কিছু ভালোবাসা থাকে যার কোনো নেই শেষ
এমন কিছু অনল থাকে যা জ্বলে অনিমেষ
এমন কিছু স্বপ্ন থাকে যা কখনও হয় না পূরণ
এমন কিছু আবেগ থাকে যার কোনো নেই ধরন
এমন কিছু মানুষ থাকে যাকে কখনও যায় না ভোলা
এমন কিছু কথা থাকে যা কখনও যায় না বলা।’

খুব স্পষ্টভাবে কথাটা আবার শুনতে পেলাম আমি, একেবারে স্পষ্ট। মনে হলো কেউ একজন আমার কানের কাছে এসে বলেছে কথাটা। বরাবরের মতো ঝট করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি— না, কেউ নেই, ফাঁকা। ঘরের ভেতর কেবল আমি, একা। যদিও এ মুহূর্তে নিপা আছে, শুয়ে আছে আমার পাশে, ঘুমাচ্ছে। কথাটা যে ও বলে নি তা ওর মৃদু নাক ডাকার শব্দ শুনেই বোঝা যাচ্ছে। তাছাড়া গলার স্বরটা কোনো মেয়েরও না, পুরুষেরও না, একেবারে একটা বাচ্চার গলা। তবে বাচ্চাটা মেয়ে না ছেলে, তা বোঝা যায় না।

ভালো করে নিপার দিকে তাকালাম আমি। ঘুমের তালে তালে ওর নাকের দু'পাশটা অল্প অল্প কাঁপছে। আরো ভালো করে আমি ওর দিকে তাকালাম। সারা মুখ লালচে হয়ে গেছে ওর। ঠিক লালচে না, কেমন যেন গোলাপি একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত মুখটায়। কী যে মায়াময় লাগছে! হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে আলতো করে ওর গাল ছুঁয়ে আমি বললাম, 'নিপা, ঘুমিয়েছো তুমি?'

কিছু বলল না নিপা। কেবল আমার হাতটা সরিয়ে দিয়ে সেখানে নিজের হাতটা রাখল। আমিও ওর হাতটা সরিয়ে দিলাম। নিপা যখনই ঘুমাক না কেন, যতক্ষণই ঘুমাক না কেন, গালে হাত দিয়ে ঘুমাবে। ব্যাপারটা ভালো লাগে না আমার। মনে হয় ঘুমের মতো আরামপ্রদ একটা ব্যাপারের সময়ও ও চিন্তা করছে, গভীর চিন্তা।

আমি গাঢ় গলায় আবার ডাকলাম, 'নিপা।'

কোনো উত্তর দিল না নিপা। আগের মতোই শুয়ে রইল। আমি এবার ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, 'নিপা, একটু উঠবে?'

নিপা উঠল না। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থেকে ঘরের লাইটটা নিভিয়ে দিলাম আমি। রাত অনেক হয়েছে, ঘুমানো দরকার। বালিশে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা আবার বলল, 'তুমি আমাকে মেরে ফেললে, বাবা!'

কথাটা আগের চেয়েও স্পষ্ট শোনা গেল, এবং এতই স্পষ্ট শোনা গেল বিছানা থেকে ঝট করে উঠে বসে কিছুটা শব্দ করে বললাম, 'কে?'

কেউ কোনো উত্তর দিল না, কিন্তু নিপার ঘুম ভেঙে গেল। ও বেশ চমকে ওঠা গলায় বলল, 'কী হয়েছে ?'

নিপার একটা হাত চেপে ধরে আমি উদ্বিগ্ন গলায় বললাম, 'তুমি কি কিছু শুনতে পেয়েছ ?'

'হ্যাঁ।' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল নিপা।

'কী ?'

'ওই যে তুমি 'কে' বললে, সেটা শুনতে পেয়েছি।'

'ওটা না। আর অন্য কিছু শুনেছ ?'

'আর কী শুনব ?' আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে নিপা বলল, 'আর কিছু বলেছ নাকি তুমি ?'

'আমি না।'

ঘরের চারপাশটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিপা বলল, 'তুমি না তো কে ? ঘরের ভেতর তো আর কাউকে দেখছি না।'

'তুমি দেখতে পাচ্ছো না, কিন্তু স্পষ্ট একজনের কথা বলা শুনেছি আমি।' ঘরের চারপাশটায় এবার আমি চোখ বুলালাম।

'কী কথা শুনেছ ?'

'শুনলাম—।' নিপার চোখের দিকে তাকালাম আমি, 'না থাক।'

নিপা কিছুটা জেদি গলায় বলল, 'থাকবে কেন ?'

'পরে বলব।'

'এখন বললে অসুবিধা কী ?'

'কোনো অসুবিধা নেই।'

'তো ?'

নিপার একটা হাত চেপে ধরলাম আমি, 'এখন বলতে ইচ্ছে করছে না, নিপা। প্লিজ, পরে শুনো।'

হেসে ফেলল নিপা। আমার মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে জরুরি একটা কথা আছে আমার।'

'জরুরি কথা! বলো।'

'দাঁড়াও, আমি একটু বাথরুম থেকে ঘুরে আসি।'

বিছানা থেকে নামল নিপা। বাথরুমের দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। চেহারা গম্ভীর করে বলল, 'তার আগে আমাকে কথা দিতে

হবে, তোমাকে যা বলব সেটা তোমার নিজের ভেতর রাখবে, আর কাউকে বলতে পারবে না। এমন কি সুমাকেও না। যদিও সুমাকে তুমি তোমার সব কথাই বলো, যেটা আমাকে বলো না। কি রাজি?'

ভাষাহারার মতো তাকিয়ে আছি নিপার দিকে। কিছু বলতে পারছি না আমি। নিপা মুচকি মুচকি হাসছে। বাথরুমের দিকে আবার এগিয়ে যেতে যেতে ও বলল, 'ঠিক আছে, তুমি ভাবো। আমি আসছি।'

নিপা বাথরুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে আমিও নামলাম। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে খাটের নিচে কেউ লুকিয়ে আছে। মেঝেতে হাঁটু ঠেকিয়ে ঝুলানো চাদরটা সরিয়ে খাটের নিচে তাকালাম। আধো আলো, আধো অন্ধকার খাটের নিচটায়। ভালো করে দেখলাম, চোখ এদিক-ওদিক করে দেখলাম। না, কেউ নেই।

উঠে দাঁড়ালাম আমি। তারপর একে একে ওয়ারড্রোবের ভেতর, কাঠের আলমারিটার ভেতর, কেবিনেট দুটোর ভেতরও দেখলাম। ফাঁকা।

পাশের ঘরের দিকে পা বাড়ানোর আগেই নিপা বাথরুম থেকে বের হতে হতে বলল, 'কী, ভেবেছ কিছু?'

কিছুটা চমকে উঠলাম আমি। নিপার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'না, কিছু ভাবি নি। তবে কথাটা তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পারো, কাউকে বলব না।'

'সুমাকেও না?'

'সুমার কথা আসছে কেন, নিপা?'

'কেন আসছে—?' নিপা এগিয়ে এসে আমার বুকে একটা হাত রেখে বলল, 'এ জায়গাটাতে যে ও এখনো আছে, যেখানে আমার ঠাঁই হয় নি, কখনো হবেও না।'

'নিপা, তুমি কিন্তু আমার স্ত্রী।'

'তো।'

'সুমা কিন্তু আমার কেউ না।'

'কেউ না!' আমার দু'বুকের দু'পাশে এবার দু হাত রেখে নিপা খুব ম্লান গলায় বলল, 'আমাকে আদর করার সময় এখনো তুমি মাঝে মাঝে সুমা সুমা করো, কোনো কোনো রাতে সুমা সুমা করে হেসে ওঠো, কখনো কখনো সুমা সুমা চিৎকার করে ঘুম থেকে জেগেও ওঠো। মানুষ যখন কোনো কিছুতে ভয় পায় তখন তার মাকে ডাকে কিংবা কোনো আপনজনকে ডাকে। তুমি সুমাকে ডাকো।' নিপার ম্লান মুখটা হঠাৎ হাসিতে ভরে ওঠে, 'চা খাবে? পাশের ঘরে যাচ্ছিল কেন? পাশের

ঘরে এখন যেতে হবে না, তুমি আরাম করে বিছানায় বসো, আমি চা বানিয়ে আনছি।' নিপা যেতে নিতেই আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'চা'র সঙ্গে আর কিছু খাবে ?'

'না।'

আগের মতোই হাসতে হাসতে নিপা কিচেনের দিকে চলে গেল। ওকে এ মুহূর্তে ঠিক স্বাভাবিক মানুষ মনে হচ্ছে না আমার। অদ্ভুত এক রহস্যময়ী মনে হচ্ছে ওকে।

ব্যাপারটা ঘটছে আজ তিন সপ্তাহ ধরে, বিশ কি বাইশদিন আগে। সকালে ঢুকেছি বাথরুমে, গোসল করব। কারেন্ট ছিল না তখন। হঠাৎ বাথরুমের কোনা থেকে কেউ একজন বলে উঠল, 'তুমি আমাকে মেরে ফেললে, বাবা!' সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে আমি বললাম, 'কে ?' কেউ কোনো কথা বলল না। ভয়ে গা'টা শিরশির করে উঠল আমার। বাথরুম থেকে বের হতে নিতেই থেমে গেলাম। মনে মনে একটু ভেবেও নিলাম। নিশ্চয় ভুল শুনেছি। নাহলে ফাঁকা এই বাথরুমে কথা বলবে কে ?

কিছুটা দ্বিধা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম বাথরুমের ভেতরেই। ভাবনার শেষ পর্যায়ে যখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম— না, ভুল শুনেছি আমি। ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার শুনতে পেলাম— 'তুমি আমাকে মেরে ফেললে, বাবা!' এবার বাথরুমের কোনা থেকে নয়, মনে হলো শাওয়ারের ওপর বসে থেকে কেউ কথাটা বলেছে।

ভালো করে শাওয়ারের দিকে তাকালাম। শুধু শাওয়ারই, অন্য কিছু নেই সেখানে। না কোনো মানুষ, না কোনো প্রাণী।

হঠাৎ মনে হলো বাথরুমের দরজার বাইরে থেকে কেউ বলছে না তো! কথাটা মনে আসতেই আলতো করে খুলে ফেললাম দরজাটা। কেউ নেই দরজার ওপাশে। বেডরুমের জানালার গ্রিলে লেজ নাচাচ্ছিল একটা দোয়েল। উড়ে গেল সেটা নিঃশব্দে।

দ্রুত গোসল সেরে বাইরে এসে বেডরুমের চারপাশটা ভালো করে দেখলাম, সব আগের মতোই আছে, স্থির, শব্দ করার মতো কোনো কিছুকেই দেখলাম না আশপাশে।

দ্বিতীয়বার যখন কথাটা শুনলাম তখন আমি আমাদের ড্রইংরুমে বসে পেপার পড়ছিলাম। মনে হলো সে শুধু কথাই বলে নি, পেপারের কোনা ধরে সামান্য টানও দিল বোধহয়। শব্দটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেপারটা কাত হয়ে গিয়েছিল একদিকে। কিংবা এও হতে পারে— মনোযোগ দিয়ে পেপার পড়ছিলাম, হঠাৎ

শব্দটা শুনে চমকে ওঠার ফলে পেপারটা হাত থেকে খসে পড়েছিল। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না ওই মুহূর্তে। বোকার মতো চারপাশে তাকিয়ে কেবল খুঁজছিলাম কে কথা বলল। না, কাউকেই পাই নি সেদিন।

সবচেয়ে চমকে উঠেছিলাম তৃতীয়বার। নিপা বাসায় ছিল না সেদিন। কোথায় যেন গিয়েছিল। কারেন্টও ছিল না তখন। চুপচাপ বসেছিলাম বারান্দায়। হঠাৎ বারান্দার কোনায় কে যেন গরগর করে উঠল, কিছুটা বিড়ালের মতো। আবার মনে হলো— না, ঠিক বিড়ালের মতো না, কাউকে গলা টিপে ধরলে যেমন শব্দ করে, শব্দটা ঠিক সেরকম। ভয় পাওয়া গলায় আমি বললাম, 'কে ?'

কোনো কথা বলল না কেউ। কিন্তু গরগরটা থেমে গেল।

বারান্দার কোনাটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি। এমন অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। উঠে গিয়ে যে ভালো করে দেখব, সেই সাহসও হচ্ছে না। মৃদু স্বরে আমি আবার বললাম, 'কে ?'

এবারও কেউ কথা বলল না।

আগের চেয়ে কিছুটা শব্দ করে বললাম, 'কে, কে ওখানে ?'

ছোট্ট করে কারো নিশ্বাস ফেলার শব্দ হলো। শব্দটা স্পষ্টই শুনলাম। একটু পর মেঝেতে পা ঘষে ঘষে হাঁটার মতো কে যেন হাঁটতেও লাগল। বুকের ভেতরটা ঠান্ডা হয়ে আসছিল আমার। নিশ্বাস নিতে ভুলে গেছি, কোনো একটা কিছু যে করা দরকার ভুলে গেছি সেটাও। বেশ কিছুক্ষণ পর ওই কোনা থেকেই বলল, 'তুমি আমাকে মেরে ফেললে, বাবা!'

ভয় পাওয়া ওই মুহূর্তটাতেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। ওই একই কথা— আমাকে মেরে ফেললে, বাবা; আমাকে মেরে ফেললে, বাবা। অসহ্য, আর কত শোনা যায় কথাটা! ঝট করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম। ভয়-টয় সব ঝেড়ে ফেলে বারান্দার কোনায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ছুঁচো দৌড়ে পালাল। আরেক ভাবনা এসে মাথার ভেতর খোঁচাতে লাগল— এই তিনতলার ওপর ছুঁচো এলো কোথা থেকে ?

অন্ধকারে বারান্দায় বসে থেকে অনেক কিছু ভাবতে লাগলাম। কোনো কিছুরই কোনো সুরাহা হলো না।

তারপর থেকে সারাক্ষণ ওই একই কথা কানের কাছে বাজতে থাকত। তবে অফিসে গেলে কথাটা আর শুনতে পেতাম না। অফিস থেকে বাসায় ফিরলেই শুনতে হতো কথাটা। বেশ কয়েকদিন সেজন্য আমি অফিস থেকে বাসায় ফিরেছি অনেক রাত করে। প্রথম প্রথম নিপা কিছু বলত না। একদিন একটু বেশি দেরি করে ফেরায় গলাটা খুব করুণ করে বলেছিল, 'আমাকে এখন আর তোমার ভালো

লাগে না, না ?' কিছু বলি নি আমি, কেবল ওর টলটল করা চোখের দিকে তাকিয়ে আমি নিজেকে খুঁজছিলাম।

ইদানীং একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমি কথাটা শুনতে পাই, ঠিক ঘুমানোর আগ মুহূর্তে। সারাদিন কোনো কিছু হয় না, ওই ঘুমানোর আগেই সে এসে বলবে— তুমি আমাকে মেরে ফেললে, বাবা! অবশ্য কেবল বাড়িতে ঘুমালেই কথাটা শুনতে পাই। এর মধ্যে অফিসের কাজে তিন রাত বাসার বাইরে ছিলাম, তখন শুনতে পাই নি।

দু'হাতে দুটো চায়ের কাপ নিয়ে নিপা হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে বলল, 'একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।'

'কী ?'

'তুমি কিন্তু না করতে পারবে না।'

'আগে সিদ্ধান্তটা বলো।'

'তার আগে চা'টা খেয়ে নাও।'

চায়ে চুমক দিয়েই দেখি, চা মিষ্টিতে ভরে ফেলেছে নিপা। একেবারে শরবতের মতো হয়েছে চা'টা, খাওয়ার অযোগ্য। কিন্তু নিপা খুব মনোযোগ দিয়ে ওর কাপে চুমক দিচ্ছে। ওর চা খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে, এর চেয়ে স্বাদের জিনিস আর পৃথিবীতে নেই।

'এটা কী বানিয়েছ তুমি ?'

নিপা আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'চা'টা বেশি মিষ্টি হয়েছে, না ?'

'খুব।'

'ইচ্ছে করেই দিয়েছি।'

'কেন ?'

'কোনো কারণ নেই। দিতে ইচ্ছে করল তাই দিলাম।' নিপা ওর কাপে আরেকবার চুমক দিয়ে বলল, 'আমার সিদ্ধান্তটা এবার বলি।'

'বলো।'

'তোমাকে আবারও বলছি তুমি কিন্তু না করতে পারবে না।'

'ঠিক আছে, না করব না।'

চায়ের কাপে শেষ চুমকটা দিয়ে নিপা চোখ তুলে আমার চোখের দিকে তাকাল। ও যে বিশেষ কিছু বলবে তা ওর তাকানো দেখেই বুঝতে পারছি।

মুখটায় হাসি এনে ও আমার একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'সুমাকে একদিন বাসায় নিয়ে আসবে, সারাদিন সেদিন ওর সঙ্গে গল্প করব আমি।'

'হঠাৎ?'

'হঠাৎ না, বেশ কয়েকদিন ধরেই ভেবেছি।'

'কেন?'

'সেটা বলা যাবে না।' খিলখিল করে হেসে ওঠে নিপা।

'তোমার সঙ্গে তো ওর পরিচয় নেই।'

'পরিচয় নেই, পরিচয় করিয়ে দেবে।'

'তুমি কি সুমাকে কখনো দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়!' নিপার দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকাই আমি।

'পুরনো কিছু চিঠি আছে তোমার, সেখানে ওর ছবি দেখেছি। তুমি আবার ভেব না আমি চুপি চুপি ছবিটা দেখেছি। কয়েকদিন আগে তোমার টেবিলের ড্রয়ারটা পরিষ্কার করছিলাম, হঠাৎ বড় একটা খাম খুলে পড়তেই সেখানে অনেকগুলো চিঠির মাঝে একটা ছবি দেখেছি আমি। আমি সিওর, ওটা সুমার ছবি। ঠিক?'

'ঠিক।'

'আমি কিন্তু কেবল ছবিটাই দেখেছি, কোনো চিঠি পড়ি নি।'

'পড়লেও কোনো ক্ষতি ছিল না।'

বাচ্চা মেয়ের মতো আমার একটা হাত খামচে ধরে নিপা উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'তুমি আমাকে চিঠিগুলো পড়তে দেবে?'

'আমাকে কিছু বলতে হবে না, তোমার যখন ইচ্ছে হবে তুমি পড়ে নিও।' সম্মতির হাসি দিয়ে আমি নিপার দিকে তাকাই, 'তোমাকে তো চিঠি পড়ার সুযোগ দিলাম, এখন কি বলা যাবে সুমার প্রতি হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠলে কেন তুমি?'

বেশ কিছুক্ষণ নিপা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মিটিমিটি হাসছে ও। হঠাৎ চেহারাটা ম্লান করে বলল, 'সুমার সঙ্গে তোমার অ্যাফেয়ার ছিল আড়াই বছর, আর আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে প্রায় তিন বছর। সুমা তোমাকে আড়াই বছরে কী দিয়েছে, যা আমি তোমাকে তিন বছরে দিতে পারি নি। এখনো তোমার মাঝে সুমা বিদ্যমান। আমি তাই ওকে একটু সরাসরি দেখতে চাই, দেখতে চাই কী আছে তোমার ওই মায়াবতীর মাঝে, যা আমার মাঝে নেই।' কথাটা শেষ করেই নিপা আবার হাসতে থাকে।

দরজায় হঠাৎ খট খট করতে করতে কে যেন ডাকতে লাগল, 'রাহাত সাহেব, রাহাত সাহেব।'

'কে ?'

'রাহাত সাহেব, আমি আপনার পাশে ফ্ল্যাটের...।'

'মোর্শেদ ভাই ?'

'জি।'

দ্রুত দরজা খুলে দেখি মোর্শেদ ভাই দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। দরজা থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, 'কী ব্যাপার, মোর্শেদ ভাই ?'

'স্যরি ভাই, এতরাতে ডিস্টার্ব করার জন্য।' মোর্শেদ ভাই নিপার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাবি, আপনার কাছেও স্যরি। আমি অবশ্য আসতে চাই নি, না এসেও পারলাম না। ভয়াবহ একটা জিনিস দেখেছি আমি।'

'কী জিনিস ?'

'বাথরুমে ছিলাম আমি এতক্ষণ। আমাদের বাথরুমের জানালা দিয়ে আপনাদের বাইরের ঘরের বারান্দাটা দেখা যায়। হঠাৎ দেখি একটা ছোট্ট বাচ্চা আপনাদের বারান্দায় লাফালাফি করছে। প্রথমে ভাবলাম ভুল দেখেছি। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, না, ভুল দেখছি না, সত্যি সত্যি দেখছি। একটু পর দেখি বাচ্চাটা আর নেই।'

'আপনি ঠিক দেখেছেন তো ?'

'অবশ্যই। না দেখলে কি আর এতরাতে আপনাদের ডিস্টার্ব করি। আপনার বাসায় তো ওরকম ছোট কোনো বাচ্চা নেই, দেখেন তো কে লাফালাফি করছিল। আমার বউ আবার বাসায় একা, আমাকে না দেখলে চিৎকার করে উঠবে। আমি এখন যাই।'

মোর্শেদ ভাই চলে যেতেই নিপা এগিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে বলল, 'উনি আর কিছু দেখলেন না, একটা বাচ্চাকে দেখলেন! তাও আবার আমাদের এই তিনতলার বারান্দায়। লোকটা নেশা-টেশা করে নাকি ?

'জানি না তো।'

'আমার তো মনে হয় করে। দেখলে না কেমন মাতাল মাতাল চেহারা। চলো তো, রাত অনেক হয়েছে, ঘুম পাচ্ছে আমার।'

'বারান্দাটা দেখে আসা উচিত না আমাদের ?'

'না, এখন বারান্দায় যেতে হবে না। কাল সকালে দেখো।'

'সকালে গিয়ে কিছু বোঝা যাবে নাকি ?'

'তুমি দেখি সত্যি সত্যি লোকটার কথা বিশ্বাস করে বসে আছো। তুমি যে কিনা, যার তার কথা বিশ্বাস করো।' নিপা আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'এখন আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। চলো, ঘুমাই।'

বিছানায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল নিপা। কিন্তু আমার ঘুম আসছে না। ঘুমের মাঝেই নিপা একবার হেসে উঠল। হাসিটা ঠিক হাসির মতো মনে হলো না, কেমন যেন মনে হলো।

নিপা ঘুমিয়ে পড়ার আধাঘণ্টা পর আবার বিছানা থেকে নামলাম আমি। নিঃশব্দে মেঝেটা পার হয়ে বাইরের রুমের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। নিশ্চুপ বারান্দা, কেউ নেই। কোনো কিছু টের পাওয়া যায় কি না তা বোঝার জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েও থাকলাম বারান্দায়। না, কোনো কিছুই টের পাওয়া গেল না।

ঘরে ফিরে আসলাম আবার। বিছানার দিকে এগিয়ে যেতে নিতেই চমকে উঠলাম আমি। পাশের ঘরে আমাদের ছোট কাজের মেয়েটা ঘুমায়। ও হাসছে, খিলখিল করে হাসছে। ভাবলাম, স্বপ্ন-টপ্ন দেখে হাসছে। কিন্তু একনাগাড়ে হেসেই যাচ্ছে মেয়েটা। স্বপ্ন দেখে সাধারণত একনাগাড়ে কেউ এভাবে হাসে না।

পা টিপে টিপে পাশের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে পর্দাটা তুলতেই চমকে উঠলাম আবার। পাশের বিল্ডিংয়ে জ্বালানো একটা লাইটের আলো এসে পড়েছে ঘরে। সেই সামান্য আলোতেই দেখি, আমাদের কাজের মেয়ে তানজি বিছানায় বসে হাসছে। হাসতে হাসতে এমন অঙ্গভঙ্গি করছে, যেন ওর সামনে কেউ বসে আছে, তার সঙ্গে ও খেলছে, মজা করে খেলছে।

সুমা বেশ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমার কথাটা ওর ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। ও অবশ্য মুখে সেটা বলে নি, কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে— আমি আবোলতাবোল কিছু বলেছি, যা অবিশ্বাস্য এবং অমূলক।

আমি যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে সুমাকে বললাম, 'তুমি আমার কথাটা বিশ্বাস করো নি, না?'

'এটা কি বিশ্বাস করার মতো কোনো কথা?'

'কিন্তু আমি মিথ্যা কিছু বলি নি, সুমা।'

'মিথ্যা বলো নি!' সুমা কপালে নেমে আসা ওর চুলগুলো ঠিক করতে করতে বলে, 'তার মানে সত্যি সত্যি একটা বাচ্চা তোমার সঙ্গে গল্প করে, যাকে আবার তুমি দেখতে পাও না।'

'ঠিক গল্প করে না, কেবল একটা কথা বলে—।'

'আমাকে তুমি মেরে ফেললে, বাবা! এই কথাটা, না?'

'হ্যাঁ।'

'আমার মাথায় কিছু আসছে না, রাহাত। এটা কী করে সম্ভব! বিজ্ঞানের এই সময়ে তোমার নিজেরই কি বিশ্বাস করা উচিত তুমি এমন একজনের কথা শোনো, যাকে তুমি দেখতে পাও না?' সুমা মুখটা হাসি হাসি করে বলে, 'সম্ভবত তোমার কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত, মানসিক কোনো ডাক্তার।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আমার এখন কী করা উচিত?'

'নিপা জানে ব্যাপারটা?'

'না।'

'ওকে বলতে হবে না? তোমার সমস্যার কথা ওকে জানাতে হবে না?'

'জানাতে ইচ্ছে করে না। ওর ওই অ্যাকসিডেন্টের পর থেকে ও প্রায়ই মন খারাপ করে থাকে। কিন্তু ও আবার সেটা আমাকে বুঝতে দিতে চায় না। তাই কথায় কথায় হাসতে থাকে ও, অকারণে হাসে। ওকে তাই আমি কোনো মন খারাপ করা কথা বলি না।'

'তবু ওর সঙ্গে শেয়ার করা উচিত তোমার।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সুমা। কী যেন ভাবে ও। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কিছুটা শব্দ করে বলে, 'আচ্ছা, তুমি কোনো অন্যায় করো নি তো ?'

'কী ধরনের অন্যায় ?'

'এই যেমন কাউকে মেরে ফেলা, বিশেষ করে কোনো বাচ্চাকে মেরে ফেলা।' সুমা খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

হেসে ফেলি আমি, 'তোমার কি মনে হয় আমি কাউকে মেরে ফেলতে পারি, তাও আবার একটা বাচ্চাকে ?'

'ভুল করে মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে।'

'আমি সেরকম ভুল করি নি, সুমা।'

'আমিও বিশ্বাস করি তুমি ওরকম কোনো ভুল করো নি, কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমার অনেক টেনশন হচ্ছে, রাহাত।' সুমা আলতো করে আমার কাঁধ ছুয়ে বলে, 'একটা লোকের কাছে নিয়ে যাব তোমাকে, যাবে ?'

'এখন ?'

'হ্যাঁ, এখনই।'

'পরে যাই ?' সুমার দিকে তাকিয়ে বলি, 'আচ্ছা, তোমার হাজবেন্ডের না আসার কথা ?'

'সে তো কবে থেকেই আসছে।'

'এবারও দেরি হবে ?'

'হ্যাঁ, কানাডায় নাকি কী একটা গোলমাল চলছে, এখন আসতে পারবে না।' মন খারাপ করে বলে সুমা।

'তুমি যাচ্ছো না কেন কানাডায় ?'

'ও নিয়ে না গেলে যাব কীভাবে ?'

'নিশ্চয় নিয়ে যাবে। ইচ্ছে করলেই তো বিদেশে কাউকে নিয়ে যাওয়া যায় না। তাছাড়া তোমার ছেলেও তো ভালো একটা স্কুলে ভর্তি হয়েছে এখানে। আঃছা, তোমার ছেলের চেহারা কেমন হয়েছে ? কার মতো হয়েছে বলো তো ?'

সুমা হাসতে হাসতে বলে, 'তোমার মতো।'

'আমার মতো। আমার মতো হলে তুমি খুশি হও ?'

'আমি তো অনেক কিছুতেই খুশি হই। আমার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বিয়ে করবে না করবে না করেও বিয়ে করেছ বলে খুশি হয়েছি, তুমি যে এখনো আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছ এতেও আমি খুশি হয়েছি, এই যে এখন আমার অফিসের

ক্যান্টিনে বসে কথা বলছ, খুশি লাগছে এতেও। আমার কি খুশির শেষ আছে, রাহাত!' সুমা আমার একটা হাত টেনে ধরে বলে, 'চলো তো, আমি আজ আর অফিস করব না। তোমাকে ওই লোকটার কাছে নিয়ে যাই।'

'কোন লোকটার কাছে ?'

'ওই যে বললাম না, একটা লোকের কাছে নিয়ে যাব তোমাকে।'

'লোকটা কে ?'

'চলোই না, গেলেই দেখতে পাবে কার কাছে নিয়ে এসেছি তোমাকে।'

'তার আগে চলো আজ বাইরে কোথাও খাব। তোমাকে নিয়ে অনেকদিন বাইরে কোথাও খাই না।'

'তোমার স্ত্রী জানলে মন খারাপ করবে না ?'

'আমার স্ত্রী জানবে।'

'কীভাবে ?'

'আমি নিজেই বলব।'

'মন খারাপ করবে না ?'

'না। আমার অনেক কিছু ও জানে, তোমারও।'

মাথাটা নিচু করে ফেলে সুমা। তবু আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। অতীত রোমন্থন করা খুবই সুখের, যদি সেটা মজার হয়। আমি নিশ্চিত সুমা এখন অতীতে চলে গেছে, মজার অতীতে।

ভদ্রলোককে দেখে মোটেই পছন্দ হলো না আমার। চশমা চোখে তাঁর, বেশ দামি চশমা। তবে চশমার একটা ডাট ভাঙা। একটা সুতো দিয়ে কানের সঙ্গে পেঁচিয়ে রেখেছেন তিনি চশমাটা। তাও আবার যা তা সুতো না, গোলাপি রঙের একটা সুতো দিয়ে।

ফুলহাতা শার্ট পরে আছেন তিনি। সেই শার্টের একটা হাতাতেও বোতাম নেই। কাকতাড়ুয়ার জামার মতো ঝুলঝুল করছে সেই হাতা দুটো। বুকের কাছের বোতামও লাগিয়েছেন উপর-নিচ করে।

ঢিলে-ঢালা নরমাল একটা প্যান্ট পরলেও সেই প্যান্টের ভেতর শার্টটা এমনভাবে গুজে ইন করছেন, খুবই হাস্যকর লাগছে তাঁকে। শার্টের বাম পাশটা প্রায় সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসেছে প্যান্ট থেকে, রামছাগলের কানের মতো ঝুলে আছে সেই বেরিয়ে আসা শার্টের অংশটা।

পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল তাঁর। সেই স্যান্ডেলটা আবার পরতে পরতে এমন ক্ষয় হয়ে গেছে, আর একটু হলেই সম্পূর্ণ ফুটো হয়ে যাবে স্যান্ডেলটা। ডান পাশের স্যান্ডেলের ফিতাটা ছিঁড়ে গেছে, লোহার চিকন তার দিয়ে আটকিয়ে রাখা হয়েছে সেটা। অবশ্য ঘরের এক কোনায় এক জোড়া চামড়ার জুতো রাখা আছে, সেটার চামড়াও এমন দুমরানো মুচরানো, যাদুঘরে রাখার সময় হয়ে গেছে ওটার।

অসম্ভব ফর্সা তিনি। হাতের আঙুলগুলো দেখে মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল সেগুলো। নীলচে ভেইনগুলো দেখা যাচ্ছে হাতের উপরি পিঠ দিয়ে। হাতের নখগুলো বড় বড়, বোঝা যাচ্ছে অনেকদিন ধরে কাটা হয় না, তবে ময়লা নেই কোনো নখেই। ঝুলে পড়া হাতের চামড়ায় পেকে যাওয়া লোমগুলো কদম ফুলের পাপড়ির মতো মনে হচ্ছে।

তাঁর চুল পেকে গেছে, ভ্রু পেকে গেছে, দাড়ি-গোঁফ দুটোই পেকে গেছে। এমনভাবে পেকে গেছে, শরতের কাশফুলের মতো মনে হচ্ছে সবকিছু। তবে দেখার মতো জিনিস হচ্ছে তাঁর দাঁতগুলো। ঝকঝকে, তকতকে, একেবার সারিবাঁধা। কোথাও একটু ফাঁক নেই, বাঁকাও নেই।

সুমা আর আমাকে দেখে তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে সামনের চেয়ার দুটোতে বসতে বলেছেন, কোনো কথা বলেন নি তিনি। তাও সেটা পনের-বিশ মিনিট হয়ে গেছে। সারা ঘর পায়চারি করে তিনি একটা বই পড়ছেন। বইয়ের মলাটটা ছেঁড়া, তাই নাম জানা যাচ্ছে না বইটার।

সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে— তাঁর সারা ঘরে বেশ কয়েকটা পশুপাখি। ঘরের কোনায় সিলিং থেকে ঝুলে আসা একটা দড়িতে খাঁচা বাঁধা, তার ভেতর একটা ময়না পাখি; লম্বা মুখের একটা কুকুর পায়ের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে মেঝেতে, তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে, যেন একটু এদিক-সেদিক হলেই কামড়ে ধরবে আমাদের; একটা নাদুস-নুদুস মেয়ে বিড়াল লোকটার সঙ্গে পায়চারি করছে, তিনি একবার এদিক এলে বিড়ালটাও এদিকে আসে, তিনি ওদিকে গেলে বিড়ালটাও ওদিকে যায়। বড় একটা অ্যাকুরিয়ামে অনেকগুলো রঙবেরঙের মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে। মজার একটা ব্যাপার হচ্ছে, একটা কাকও আছে ঘরে, তবে খাঁচায় নয়, লোহার একটা শিকল দিয়ে কাকটার পা বাঁধা, একটা কাঠের স্ট্যান্ডের ওপর বসে আছে বিজ্ঞ পণ্ডিতের মতো।

বইটা বন্ধ করে তিনি ময়নাটার খাঁচার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুখটা হাসি হাসি করে ফেললেন তিনি। তারপর মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'বলো তো ময়না মামা, পৃথিবীর একমাত্র অকৃতজ্ঞ প্রাণী কোনটি?'

ময়নাটা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'মানুষ।'

'গুড।' লোকটি থেমে আবার বললেন, 'সবচেয়ে লোভী প্রাণী কে?'

ময়নাটা আবার বলল, 'মানুষ।'

'সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী?'

'মানুষ।'

'পৃথিবীর আর কোনো প্রাণী, যেমন কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল করে না, কিন্তু অন্য একটা প্রাণী আছে যে সামান্য কারণেই কিংবা অকারণেই তার স্বগোত্রিয়কে হত্যা করে। কোন প্রাণী সেটা, বলো তো?'

ময়নাটি এবার শব্দ করে বলে উঠল, 'মানুষ, মানুষ।'

'আচ্ছা, এবার আপনারা বলুন তো—।' লোকটি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে খুব আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'মানুষ যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলে দাবি করে, সেটা কি ঠিক?'

সুমা আর আমি কেউই কোনো উত্তর দিলাম না, চুপচাপ বসে রইলাম।

'না, চুপ করে বসে থাকা যাবে না। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।' লোকটি কিছুটা বোল্ডলিই বললেন।

'হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে ঠিক না।' কিছুটা দ্বিধা নিয়ে আমি বললাম।

'মানুষ যেমন তার সমাজে নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করে; তেমন তো পিঁপড়াও তার সমাজে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করতে পারে, শেয়ালও তার সমাজে প্রচার করতে পারে, পেঁচা, গরু, ছাগল, মহিষও পারে। কি, পারে না?'

'জি, পারে।'

'তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?'

আবার আমরা চুপ হয়ে রইলাম। তাই দেখে তিনি বললেন, 'আপনারা আবার চুপ করে রয়েছেন। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল— প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সমাজে শ্রেষ্ঠ। ঠিক?'

সুমা অস্ফুট স্বরে বলল, 'ঠিক।'

'তা, এবার বলুন, আপনারা আমার কাছে কেন এসেছেন?'

'একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি।' সুমা আগের মতোই অস্ফুট স্বরে বলল।

'আমার কাছে সবাই সমস্যা নিয়েই আসে। সমস্যাটা বলে ফেলুন।' লোকটি একটা চেয়ার টেনে তার ওপর দু'পা তুলে বসলেন, 'তার আগে বলুন সমস্যাটা কার?'

সুমা আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ওর।'

'আপনার!' লোকটি হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দাঁড়ান, একটা জিনিস ভুলে গেছি। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর ময়নাটাকে প্রত্যেকবার কয়েকটা ভেজানো ছোলা দেই আমি। এখন দেওয়া হয় নি। ছোলাগুলো ওকে দিয়ে তারপর আবার কথা বলি আপনাদের সঙ্গে।'

ঘরের কোনায় ভাঙা মতো কাঠের একটা টেবিল আছে, তার ওপর ছোট একটা কাচের বাটিতে ছোলা ভেজানো আছে, সেদিকে এগিয়ে গেলেন লোকটা। তারপর ওখান থেকে কয়েকটা ছোলা নিয়ে ময়নাটাকে দিলেন। ছোলাগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কু কু শব্দ করতে করতে খেতে লাগল সেগুলো ময়নাটা।

লোকটি আবার আমাদের দিকে এগিয়ে এসে চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'আচ্ছা, আপনারা আমার নাম জানেন তো?'

ক্লাসে স্যারের প্রশ্ন পারার মতো উৎসাহ নিয়ে সুমা বলল, 'জি।'

'নামের বানানটা বলুন তো?'

'হ-এ আকার, য়-এ আকার, ত-।'

সুমা কথা শেষ হওয়ার আগেই লোকটা মাথা এদিক ওদিক ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'না না হলো না। ত এর জায়গায় খণ্ড ত হবে। বিশিষ্ট অভিনেতা আবুল হায়াত সাহেবের হায়াত না, আমার নাম হচ্ছে হায়াৎ, হায়াৎ রাস্তি। রাস্তি মানে জানেন তো?'

লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতে আমি বললাম, 'না, জানি না।'

শিশুদের মতো হেসে উঠে হায়াৎ রাস্তি সাহেব বললেন, 'আমিও জানি না। তবে শুনেছি নরওয়ের মুসলমানরা যেন কী একটা ধর্মীয় উৎসব করে, তার নাম রাস্তি। আবার শরীয়তপুরের একটা জায়গার নাম আছে রাস্তি। কিন্তু নরওয়েতে আমাদের কেউ কখনো থাকে নি, এখনো থাকে না কিংবা আমার জন্ম কিন্তু শরীয়তপুরের সেই রাস্তিতেও না যে নামের শেষে রাস্তি লাগিয়েছি। যেমন অনেকে হেমায়েতপুরে জন্মগ্রহণ করে নামের শেষে হেমায়েতপুরী লাগায়, সায়দাবাদে বাস করে সায়দাবাদী লাগায়, সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করে সিরাজী লাগায়। আমার বাবা একজন সাধারণ স্কুল শিক্ষক ছিলেন সেই ব্রিটিশ আমলে, আমার জন্মও তখন। সেই আমলে আমার নামের শেষে কেন তিনি রাস্তি লাগালেন তা আজও আমি বুঝে উঠতে পারি নি। আচ্ছা, নামটা শুনতে কি খুব খারাপ লাগে?'

'না না, খুব সুন্দর।' সুমা আগের চেয়ে উৎসাহী হয়ে বলে, 'একেবারে আধুনিক একটা নাম।'

'কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অনেকেই নামটা লিখতে বানানে ভুল করে, ৎ'র জায়গায় ত লেখে। সে যাক গে—।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব মাথা চুলকাতে চুলকাতে কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, 'আমরা কী একটা সমস্যা নিয়ে যেন আলাপ করছিলাম ?'

'জি, ওর সমস্যা নিয়ে।' সুমা আবার আমাকে দেখিয়ে বলল।

'সমস্যাটা কী বলুন।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব মনোযোগ দিয়ে কথা শোনার জন্য সামনের টেবিলের দিকে একটু ঝুঁকে এলেন।

'সমস্যাটা আসলে ঠিক কী সেটা আমিও বুঝতে পারছি না।' চোখ দুটো নিচু করে কথাটা বললাম আমি।

'এটা কী বললেন আপনি! আপনি নিজেই আপনার সমস্যা বুঝতে পারছেন না, তাহলে আমার কাছে এসেছেন কেন ? আগে নিজের সমস্যা নিজে বের করুন, তারপর আমার কাছে আসুন।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, 'আমার সময়ের খুব অভাব, অযথা অনেক সময় নষ্ট করলেন আমার।'

'আসলে।'

ঘুরে দাঁড়ালেন হায়াৎ রাস্তি সাহেব, 'আসলে ?'

'আসলে আমি বুঝতে পারছি না কথাটা কীভাবে বলব।'

চেয়ারে বসলেন আবার হায়াৎ রাস্তি সাহেব, 'অত ভাবনা-চিন্তা করতে হবে না আপনার। আপনি নির্দ্বিধায় খুব সহজভাবে প্রথম থেকে শুরু করুন।'

'আমি প্রায় রাতেই একটা বাচ্চা ছেলের কথা শুনতে পাই।'

'কেবল রাতেই শোনেন, আর কখনো শোনেন না ?'

'না, আর কোনো সময় শুনি না। আর কথাটা কেবল বাসায় ঘুমালেই শুনতে পাই, বাসার বাইরে ঘুমালে শুনতে পাই না।'

'বাসার বাইরেও ঘুমান নাকি আপনি ?'

'মাঝে মাঝে অফিসের কাজে বাইরে কাটাতে হয় তো।'

'তখন যে হোটেলে বা বাসায় থাকেন সেখানে বাচ্চাটার কথা শুনতে পান না, এই তো ?' হায়াৎ রাস্তি সাহেব পলকহীন চোখে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন।

'জি।'

'কতদিন ধরে এ রকম হচ্ছে ?'

'সপ্তাহ তিনেক ধরে।'

হায়াৎ রাস্তি সাহেব সুমার দিকে ইশারা করে বললেন, 'ইনি কী হন, আপনার স্ত্রী ?'

'জি, না।'

'আপনি বিয়ে করেছেন তো ?'

'জি।'

'তাহলে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আসলেন না কেন ?'

'একটু সমস্যা আছে।'

'আপনি আপনার স্ত্রীকে ব্যাপারটা জানাতে চান না, না ? কিন্তু ব্যাপারটা আপনার স্ত্রীকে জানানো দরকার।'

'আমার মনে হয় আমার স্ত্রী ব্যাপারটা জানে।'

'কীভাবে বুঝলেন ?'

'তা বলতে পারব না।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ চোখ বুজে বসে রইলেন হায়াৎ রাস্তি সাহেব। আমি আর সুমা তার সামনে বসে আছি। একটু পর খেয়াল করি মৃদু মৃদু নাক ডাকছেন তিনি। চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন হায়াৎ রাস্তি সাহেব। আমি ভালো করে মানুষটার দিকে তাকালাম। অল্প হা করা মানুষটা, শিশুর মতো লাগছে তাকে— সরল, প্রশান্তিময়, নিশ্চিত।

মিনিট পাঁচেক পর হঠাৎ জেগে উঠে তিনি বললেন, 'স্যরি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যদিও এখন আমার ঘুমানোর সময়।' উঠে দাঁড়িয়ে পেছনের সেলফ থেকে দুটো কাগজ এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এখানে কিছু প্রশ্ন আছে, আপনি আর আপনার স্ত্রী আলাদাভাবে পূরণ করে রাতে একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তবে আপনি একা আসবেন না, আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন।'

সুমাকে দেখিয়ে আমি বললাম, 'ও কি আসতে পারবে ?'

'পারবেন। তবে উনি আসবেন না।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব সুমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'কী ঠিক ?'

সুমা কিছু বলল না। মাথাটা নিচু করে ফেলল।

'আর শুনুন।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব পেছনে কুকুরটার দিকে একবার তাকিয়ে আবার ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'এ এক ঘণ্টায় কোনো পানি খেয়েছেন আপনারা ? প্রতি এক ঘণ্টায় এক গ্লাস পানি খাওয়ার চেষ্টা করবেন, কিডনি ভালো থাকবে। আমার মা খুব কম পানি খেতেন, তিনি অনেক কষ্ট পেয়ে কিডনি রোগে মারা

গেছেন। ওই যে ঘরের কোনায় পানি আর গ্লাস আছে, একটু কষ্ট করে খেয়ে নেবেন, প্লিজ।'

হায়াৎ রাস্তি সাহেব ঘনঘন হাই তুলছেন, তার এখন ঘুমানোর সময়, সত্যি সত্যি ঘুম পেয়েছে তার। আমরা চলে আসতে নিতেই হায়াত রাস্তি সাহেব বললেন, 'একটা কাজ যে বাকি রয়ে গেল।'

আমরা প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ঘুরে দাঁড়ালাম। হায়াৎ রাস্তি সাহেব হাসতে হাসতে পাশের একটা কাচ ঘেরানো বাক্স দেখিয়ে বললেন, 'ওখানে কিছু দেখতে পাচ্ছেন ?'

'জি, অনেকগুলো একশ' টাকার নোট।'

'আমার সঙ্গে যেই দেখা করতে আসে, তাকে আমি অনুরোধ করি ওখানে একশ' টাকার একটা নোট রাখতে। টাকাগুলো আমার জন্য না, বিশেষ একটা কারণ আছে টাকাটা নেওয়ার।'

পকেট থেকে একশ' টাকার একটা নোট বের করলাম আমি, সুমাও ওর ব্যাগ থেকে একটা নোট বের করল। হায়াৎ রাস্তি সাহেব তাই দেখে বললেন, 'না না, একজন দিলেই চলবে।'

সুমা খুব বিনয়ী হয়ে বলল, 'দুজন দিলে কি অসুবিধা হবে ?'

'না, তা হবে না।'

কাচের বাক্সটার ভেতর আমি আর সুমা এক সঙ্গে নোট দুটো রাখলাম। রাহাত রাস্তি সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'থ্যাংক ইউ।'

ঘর থেকে বের হয়ে এলাম আমরা। ভদ্রলোকটাকে দেখে প্রথমে পছন্দ হয় নি আমার, কিন্তু এখন ভালো লাগছে মানুষটাকে, অসম্ভব ভালো।

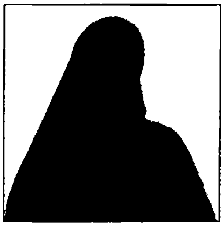

বাসায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নিপা কিছুটা রাগী গলায় বলল, 'তোমার মোবাইল বন্ধ, তোমার অফিসে ফোন করেছিলাম, অফিসেও ছিলে না তুমি! ব্যাপার কী ?'

'ব্যাপার কিছুই না, মোবাইলে চার্জ ছিল না।' মোবাইলটা চার্জ দিতে দিতে বলি আমি।

'কিন্তু অফিসে ছিলে না কেন, কোথায় গিয়েছিলে ?'

'সুমার অফিসে গিয়েছিলাম।'

'কেন, সুমার কোনো প্রবলেম ?'

'সুমার না, আমার।'

খিলখিল করে হেসে ওঠে নিপা, 'তোমার আবার কী প্রবলেম ?'

'আমার কোনো প্রবলেম থাকতে পারে না!'

'পারে।' নিপা নিস্পৃহ গলায় বলে, 'আর সেই প্রবলেমের কথা কেবল সুমাই জানে, আমি জানতে পারি না কখনো।'

'তোমার নিজেরই অনেক প্রবলেম, তোমাকে আর কোনো সমস্যার কথা বলতে ইচ্ছে করে না, নিপা।' নিপার দিকে একটু এগিয়ে যাই আমি, তারপর ওর একটা হাত ধরি।

নিপা আমার হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'আমি নিজেই আবার প্রবলেম হয়ে যাচ্ছি না তো তোমার কাছে ?'

'এটা কোনো কথা হলো, নিপা ?'

'হ্যাঁ, কথা তো বটেই। মানুষ বদলায়, কারণ-অকারণে বদলায়, সুযোগ পেলেই বদলায়।' কথাটা বলেই নিপা খিলখিল করে হেসে ওঠে, 'খুব জ্ঞানী লোকের মতো কথা বললাম, না ?'

আমিও হেসে বলি, 'তুমি তো জ্ঞানীই, অনেক জ্ঞানী।'

'তেল দিচ্ছো আমাকে ?'

'তোমার কি তেলের অভাব, গতকালই তো পাঁচ লিটারের তেল এনে দিলাম তোমাকে।'

নিপা আবার হাসতে থাকে, শব্দ করে হাসতে থাকে। অবাক হয়ে আমি নিপার দিকে তাকাই। নিপা কখনো এভাবে হাসে নি। অন্তত বিয়ের পর থেকে ওকে এভাবে হাসতে দেখি নি আমি। হাসতে হাসতে কী একটা বলতে চাচ্ছে ও আমাকে, কিন্তু হাসির জন্য বলতে পারছে না। অনেকক্ষণ এভাবে হাসার পর হঠাৎ থেমে গিয়ে বলে, 'হাসিটা কি খুব বেশি হয়ে গেল ? হোক, মাঝে মাঝে এভাবে বেশি বেশি হাসা ভালো। আমি মাঝে মাঝে এভাবে হাসব, তুমি কিন্তু আবার বিরক্ত হয়ো না।' কিচেনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে নিপা বলে, 'হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও, চা নিয়ে আসছি আমি।'

স্পষ্ট টের পেলাম আমি— বদলে যাচ্ছে নিপা নিজেই, আমি নই। ওর অনেক কিছুই ইদানীং অস্বাভাবিক লাগে আমার, আমি কিছু বলি না। সেদিন আমাদের কাজের মেয়ে তানজি ডিনার সেটের একটা প্লেট ভেঙে ফেলেছিল ধুতে গিয়ে। বেডরুমে আমি আর নিপা গল্প করছিলাম। কিচেনে প্লেট ভাঙার শব্দ শুনেই সেখানে দৌড়ে গেল নিপা। তারপর তানজিকে বেডরুমে টেনে এনে আমাকে বলল, 'দেখেছ, মেয়েটা হাত কেটে কী করেছে ?'

টপ টপ করে রক্ত পড়ছে তানজির বাম হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে। আমি দ্রুত বিছানা থেকে উঠে এসে বললাম, 'কীভাবে এটা হলো ?'

'কীভাবে আবার! প্লেটটা ভেঙে ফেলার পর সেটা আবার দ্রুত তুলতে গেছে বেসিন থেকে। ভাঙা প্লেটের সঙ্গে লেগে কেটে গেছে হাতটা। স্যাভলন আর তুলা দাও তো, রক্ত সব বের হয়ে গেল।'

বাথরুম থেকে স্যাভলন আর তুলা এনে দেখি রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। দ্রুত পরিষ্কার করে স্যাভলন আর তুলা দিয়ে হাত বেঁধে তানজিকে নিপা বলল, 'যা, শুয়ে থাক এখন। কোনো কাজ করতে হবে না তোর আজ। কীভাবে যে কাজ করিস, হাত-টাত কেটে একাকার। যা, দাঁড়িয়ে আছিস কেন, শুয়ে পড়। খবরদার, আমি না ডাকা পর্যন্ত বিছানা থেকে উঠবি না। এই শোনো।' নিপার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওকে একটু শুইয়ে দাও তো তুমি। মেঝে আর বেসিনের জিনিসপত্রগুলো ধুয়ে আমি আসছি।'

তানজির ঘরে ওকে শুইয়ে দিয়ে এসে দেখি, নিপা খুব যত্ন করে মেঝেটা পরিষ্কার করছে। এত মনোযোগ দিয়ে ও কাজটা করছে, আমি যে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছি তা টেরই পায় নি ও।

অবাক হয়ে আমি তাকিয়ে থাকি নিপার দিকে। কয়দিন আগে যদি এই প্লেট ভাঙার ব্যাপারটা ঘটত, তানজির গালে অন্তত একটা থাপ্পড় পড়তই। তারপর বকা-ঝকা তো আছেই। আর এই বকা-ঝকা চলত কয়েক ঘণ্টাব্যাপী। শেষে

রাগের মাত্রাটা আরো একটু বাড়িয়ে দিয়ে তানজির গালে পড়ত আরেকটা থাপ্পড়। অথচ আজ এসবের কিছুই হলো না। নিপা আন্তরিকভাবে মেঝেটা মুছেই চলছে, যত্ন করে মুছছে।

খুব স্পষ্ট মনে আছে আমার, বেশ কিছুদিন আগের কথা। মশারি টানিয়ে ঘুমায় নি তানজি। ইদানীং অনেকেরই ম্যালেরিয়া-ট্যালেরিয়া হচ্ছে, তাই মশারি টানিয়ে ঘুমানো বাধ্যতামূলক। নাহলে অসুখ-টসুখ হলে ঝামেলা পোহাবে কে? নিপা হঠাৎ বিছানা থেকে নামতেই আমি জিজ্ঞেস করি, 'কোথায় যাচ্ছো?'

'তানজির ঘরে।'

'কেন?'

'দেখি, মশারি টানিয়েছে কি না?'

নিপা তানজির ঘরে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে একটা শব্দ শুনলাম। দ্রুত আমি উঠে ও ঘরে দেখি গালে হাত দিয়ে তানজি কাঁদছে। মশারি টানায় নি ও। আমাকে দেখেই নিপা আরো রেগে গিয়ে বলল, 'তুমি একটা কথাও বলবে না, তুমি যাও, ঘুমাও।'

ভদ্রলোকের মতো আমি চলে এলাম ও ঘর থেকে। একটা কথা বললেই আরো দশটা কথা শুনতে হবে আমাকে। রাত বেশ হয়েছে, বলা যায় না এই নিঃশব্দ সময়ে আশপাশের অনেকের কানেও কিছু না কিছু পৌঁছে যেতে পারে।

তানজির হাত ধরে নিপা দ্রুত চলে এলো আমাদের বেডরুমে। তারপর বারান্দার দরজাটা খুলে সেখানে তানজিকে ঠেলে দিয়ে আবার বন্ধ করে দিল দরজাটা। সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, 'এটা কী করলে?'

'তোমাকে না কথা বলতে না করেছি?'

'আমি তো কথা বলি নি, একটা প্রশ্ন করেছি।'

নিপা রাগে গজগজ করতে করতে বলল, 'মশার কামড় খাওয়ার শখ হয়েছে ওর, বারান্দায় অনেক মশা আছে, ওখানে থাকুক কয়েক ঘণ্টা। দেখুক মশার কামড়ের কত মজা!'

'ব্যাপারটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'ঠিক-অঠিক বুঝি না, ও মশার কামড় খেতে চায়, মশার কামড় খাক ও। আমি ঘুমালাম, খবরদার দরজা খুলবে না তুমি। কিছুক্ষণ থাকুক, তারপর দেখি কী করা যায়।' বিছানায় শুয়ে পড়ল নিপা, একটু পর ঘুমিয়েও পড়ল। কেবল ঘুম এলো না আমার। ছোট্ট একটা মেয়ে! কী যে যন্ত্রণা না! বিশ-পঁচিশ মিনিট পর নিপা গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়তেই তানজিকে ঘরে নিয়ে আসি আমি। তারপর নিজেই মশারী টাঙিয়ে দেই ওর।

এখন তানজিকেও মশারি টাঙাতে হয় না, আমাকেও না। তানজির মশারি এখন স্বয়ং নিপা টাঙিয়ে দেয়! নিপার কী যে অদ্ভুত পরিবর্তন! আমি কিছুই বুঝতে পারি না।

হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আসতেই নিপা কিচেন থেকে হাজির। শুধু চা না, ট্রেতে অনেকগুলো খাবার এনে ও বলল, 'তুমি কি কোনো পুতুল কিনে এনেছিলে বাসায়?'

'কিসের পুতুল?'

'লাল রঙের একটা পুতুল।'

'না তো। পুতুল কোথায় দেখলে তুমি?'

'তানজির ঘরে কাপড় রাখার বাক্সটার ভেতর দেখেছি। কাপড়-চোপর দিয়ে পুতুলটা ঢাকা ছিল।'

'তানজিকে কিছু জিজ্ঞেস করেছ?'

'করেছি। ও কিছু বলতে পারে না।'

'আশপাশের কেউ ওকে দেয় নি তো?'

'ওর কি পুতুল খেলার বয়স আছে যে ওকে পুতুল দেবে!'

'প্রলোভন দেখানোর জন্যও তো কেউ দিতে পারে।

'সেরকম কাউকে তো দেখছি না।'

'বিষয়টা কিন্তু চিন্তার।'

সত্যি সত্যি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলাম আমি। সুমী নামে আমাদের একটা কাজের মেয়ে ছিল। খুবই চটপটে, খুবই চঞ্চল। যত কাজই থাক, দিনের কাজ দুপুর দুইটা আর রাতের কাজ রাত সাড়ে আটটার মধ্যে শেষ করে ফেলত ও। কারণ, দুপুরে খাওয়ার পর ও ঘড়ি ধরে এক ঘণ্টা সাজত আর রাতে কাজ শেষ করার পর টিভি দেখতে বসত। ওই সময় দুটোতে ও কারো কথাই শুনত না, কোনো কাজও করত না। আমরাও ওই সময়টাতে তেমন কিছু বলতাম না ওকে, যত প্রয়োজনই থাক তবুও না।

কোনো এক আত্মীয়ের বাসায় দাওয়াত খেতে গেছি এক রাতে। সাধারণত ঘরের বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে কোথাও যাই না আমরা। সুমীই ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে দেয়। এতে অবশ্য দু-তিনবার বেশ অসুবিধা হয়েছে। বাইরে থেকে এসে কলিংবেল টিপলেও দরজা খুলে দিত না সুমী। প্রথমবার তো বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম— মারা-টারা গেল না তো! আধাঘণ্টা ধরে কলিংবেল টিপি, দরজা ধাক্কাই, চিৎকার করে সুমীকে ডাকি, তবুও দরজা খোলে না ও। আশপাশের

ফ্লাটের অনেকেই জড়ো হয়ে গেছে। কেউ বলে দরজা ভেঙে ফেলেন, কেউ বলে পুলিশে খবর দেন, একেকজনের একেক রকমের উপদেশ। অনেক সাধনার পর শেষে চোখ ডলতে ডলতে দরজা খুলে দেয় সুমী। এতক্ষণ ও ঘুমিয়ে ছিল!

তিনবার একই ব্যাপার ঘটেছে, আমরা তাই এখন বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে যাই, সেদিনও গিয়েছিলাম। বেশ রাতে বাসায় ফিরে তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখি, সুমী নেই। এ ঘরে নেই, ও ঘরে নেই, বারান্দায় নেই, বাথরুমে নেই— কোথাও নেই। অথচ বাইরে থেকে তালা ঠিকই লাগানো আছে। সারা বাসা তন্নতন্ন করে খুঁজে ওকে পাওয়া গেল না কোথাও। নিপার দিকে তাকিয়ে দেখি, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ওর চেহারাটা। বুদ্ধি-সুদ্ধিও বোধহয় কমে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। আমার একটা হাত খামচে ধরার মতো চেপে ধরে বলে, 'বাইরে থেকে ঘরে তালা লাগানো, কিন্তু ঘরের ভেতর সুমী নেই। আমার মনে হয় জিন এসে নিয়ে গেছে সুমীকে।'

'এটা কী বলছ তুমি! জিন কীভাবে নিয়ে যাবে ওকে?'

'জিন না নিলে সুমী কই গেল? ঘরের তালা লাগানো আছে ঠিকই, কিন্তু সুমী নাই। এবার তুমিই বলো, ও কোথায় গেছে?' পাগলের মতো আচরণ করতে লাগল নিপা। আমি ওকে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলাম, শান্ত হতে বললাম মাথায় হাত দিয়ে। তারপর বারান্দার গ্রিল চেক করতে লাগলাম মনোযোগ দিয়ে, সেটা কেটে কোনো দড়ি বা অন্য কিছু বেয়ে নেমে গেছে কিনা নিচে। না, বারান্দার গ্রিলের কোথাও কোনো অংশ ভাঙা নেই।

নিপা হঠাৎ বসা থেকে লাফ দেওয়ার মতো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাদের সামনের বাসা আর পেছনের বাসার দুই মহিলার সঙ্গেই ও সবসময় কথা বলত। দেখো তো, ওরা কিছু করল কিনা?'

দু'বাসায় গিয়ে সুমীর কথা জিজ্ঞেস করলাম, তারা দুজনই আকাশ থেকে পড়লেন এবং তারা উল্টো উকিলের মতো জেরা করতে লাগলেন আমাকে— সুমী কোথায় গেল, আমরা তাকে কোথায় রেখে গিয়েছিলাম, ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্রুত চলে এলাম বাসা দুটো থেকে।

নিপা অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়, আমাকে দেখে দ্রুত এগিয়ে এসে বলল, 'খবর কী?'

সব কথা শুনে নিপা বলল, 'আমাদের নিচের তলায় ফর্সা মতো একটা মেয়ে আছে না, ওই যে খালি টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। ওর সঙ্গে তো সুমীর খুব খাতির, ওকে জিজ্ঞেস করো তো। একটু ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করবে, গাই-গুই করতে পারে। একটু চাপ দিয়ে বললেই সুমী কোথায় জানা যাবে।'

নিচের তলায় গিয়ে ফর্সা মেয়েটাকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটা কেঁদে ফেলল। ওর মা তাই দেখে মেয়েটাকে একটা লাঠি দিয়ে পেটাতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, 'কুত্তার বাচ্চা, তকে না কইছি, কারো লগে খাতির রাখবি না। ওই মাইয়া কার হাত ধইর‍্যা পলাইছে, আর সন্দেহ করছে তোরে। হারামজাদি, আর কারো লগে খাতির করবি...।' বলেই মেয়েটাকে আরো পেটাতে লাগলেন।

বাসায় ফিরে এসে নিপাকে নিচের তলার ঘটনা খুলে বললাম। ও কথা শুনছে আর তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। কৌতূহল নিয়ে আমিও নিপার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। আমাদের বাসার পাশে দুইটা প্লট এখনো খালি আছে। শেষের প্লটটাতে পাড়ার ছেলেরা লাইট জ্বালিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলে। কিন্তু জায়গাটা এখন অন্ধকার। নিপাকে আমি বললাম, 'কী দেখছ?'

নিপা মনোযোগ দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল, 'একটা জিনিস খেয়াল করেছ?'

'কী?'

'আজ কেউ এখানে খেলতে আসে নি।'

'হ্যাঁ।'

নিপা ঝট করে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার মনে হয় কী জানো, সুমী ওই ছেলেদের কারো সঙ্গে পালিয়েছে।'

'সুমী তো সব সময় বাসার ভেতরেই থাকে, মাঝে মাঝে ছাদে যায়। কারো সঙ্গে পালালে তো প্রথমে যোগাযোগ করতে হবে, সুমী ওদের সাথে যোগাযোগ করবে কীভাবে?'

'সুমী কিন্তু অল্প অল্প লিখতে পারে, ওকে আমরা লেখার জন্য একটা খাতাও দিয়েছি। আমার মনে হয় ও কোনো চিঠি লিখে কারো সঙ্গে যোগাযোগ করেছে অনেকদিন ধরে এবং আজ পালিয়েছে তার সঙ্গে। তুমি দেখছ না, আজ কেউ খেলতে আসে নি।'

'আমার মনে হয় না এরকম কিছু ঘটেছে।'

'তুমি নিচে গিয়ে একটু খোঁজ নাও না। থরথর করে আমার হাত-পা কাঁপছে।' ধপাস করে নিপা বসে পড়ল বিছানায়।

নিচে নেমে আমি অনেক কিছু খোঁজ করলাম, কিন্তু কোনো কিছুই জানতে পারলাম না। বাসায় ফিরে এলাম আবার। সঙ্গে সঙ্গে নিপা দৌড়ে এসে আমার সামনে একটা কাগজ মেলে ধরে বলল, 'এই দেখো, সুমীর চিঠি।'

'সুমীর চিঠি! কাকে লিখেছে ?'

নিপা চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'আমাকে আর তোমাকে লিখেছে, পড়ে দেখো।'

পিরিও আফু আর বাইয়া

আমার আর বাসাত কাজ কইরতে ভালো লাইগছে না। ডাকা সহরের অনেক মাইয়া গারমেনসে কাম করে, আমিও গারমেনসে কাম কইরতে চাই। বাসা থাইকা তাই চইলে গেলাম। আফু আফনার পুরান একডা চামরার জুতা নিইয়া গেলাম।

আফনারা আমাকে মাপ কইরা দিইয়ন।

ইতি সুমী

চিঠিটা পর পর দুবার পড়লাম আমি। তারপর নিপার দিকে তাকালাম, 'কোথায় ছিল চিঠিটা ?'

'আমার মেক-আপ বক্সের নিচে।'

'এখন উপায় ?'

'আম্মুর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, আম্মু বলল থানায় গিয়ে এখনই একটা ডায়েরি করতে।'

দ্রুত পল্লবী থানায় গিয়ে ডায়রি করে বাসায় ফিরে দেখি, নিপা কেঁদে-টেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে। আমি যত ওর কান্না থামাতে চাই, ও তত বেশি কাঁদতে থাকে। ওকে ঘুমাতে বলি, ও ঘুমায় না। ঘুম আসে না আমারও। যদিওবা একটু ঘুম পায় সঙ্গে সঙ্গে ফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। সারাদেশে আমাদের সমস্ত আত্মীয়স্বজন এরই মধ্যে জেনে গেছে আমাদের কাজের মেয়ের কথা। একের পর এক ফোন আসছে, প্রশ্ন করছে, একের পর এক তার জবাব দিয়ে যাচ্ছি।

ভোর রাতে আমার শাশুড়ি চট্টগ্রাম থেকে ফোন করলেন আমাকে, 'রাহাত, পল্লবী থানায় নাকি একটা মেয়েকে ধরে এনেছে, সুমী নাম মেয়েটির। তুমি গিয়ে দেখো তো।'

'আপনি কীভাবে খবর পেলেন, মা ?'

'আমার গ্রামের এক বড় ভাই আছেন, ওনাকে তোমার কাজের মেয়েটার কথা বলেছিলাম। পল্লবী থানায় ওনার পরিচিত লোক আছে, উনি বলে রেখেছিলেন তাদের। মেয়েটাকে ধরে এনে খবর দিয়েছেন বড় ভাইকে, বড় ভাই আবার আমাকে জানালেন। তুমি এখনই যাও।'

হাত-মুখ না ধুয়ে কোনো রকম কাপড় পড়ে পল্লবী থানায় গিয়ে দেখি, ওসি সাহেবের রুমে বসে আছে সুমী, কোলের ওপর একটা পলিথিনের ব্যাগ, তার মধ্যে ওর কাপড়-চোপর। পায়ে নিপার পুরান চামড়ার স্যান্ডেলটা। বুকের ভেতরটা একেবারে শীতল হয়ে এলো আমার।

ওসি সাহেব আমাকে দেখে বললেন, 'আপনি রাহাত সাহেব?'

'জি।'

'বসুন।'

চেয়ারে বসতেই পাশে বসা সুমীকে দেখিয়ে বললেন, 'এটাই কি আপনার কাজের মেয়ে?'

'জি।'

ওসি সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'ও প্রসঙ্গে পরে যাই, নিশ্চয় সারা রাত ভালো ঘুম হয় নি আপনার। নাস্তা আনাই, আগে নাস্তা করুন।'

'আমার এখন আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'না করারই কথা। চা আনাই, আপনি বরং চা খান।'

চা খেতে খেতে ওসি সাহেব বললেন, 'সবুর চৌধুরী সাহেব আপনার কে হন?'

'আমার শাশুড়ির গ্রামের বড় ভাই।'

'বড় ক্ষমতাবান মানুষ। রাত দুইটার দিকে তিনি আমাকে ফোন দিয়ে আপনার কাজের মেয়ের কথা বললেন।'

'আমি অবশ্য একটা ডায়েরি করে গিয়েছিলাম।'

'সেটা পরে দেখেছি আমি। ওনার ফোন পেয়ে আমি নিজেই আমার কয়েকজন লোক নিয়ে বেরিয়ে পড়ি বাইরে। সারা মিরপুর ঘুরে ব্যর্থ হয়ে দুয়ারীপাড়া দিয়ে থানায় ফিরছিলাম। হঠাৎ রাস্তার পাশে বিশাল একটা জটলা দেখে গাড়ি থামাই আমি। দেখি, আপনার এই কাজের মেয়েটাকে ঘিরেই জটলাটা হয়েছে।'

'এতরাতে ও রাস্তায় ছিল!'

'আপনার বাসা থেকে পালিয়ে আসার পর একটা মেয়ে তার বাসায় নিয়ে আসে এই মেয়েটাকে। কিন্তু মেয়েটার পরিবার বাসায় রাখতে সাহস পাচ্ছিল না ওকে, কী না কী ঝামেলা হয়। মেয়েটাতো বড় হয়ে গেছে। ঝামেলা এড়াতে শেষে ওকে রাস্তায় রেখে যায় ওরা। তখনই বেশ কয়েকটা ছেলে ঘিরে ধরে ওকে। আপনার ভাগ্য ভালো রাহাত সাহেব, ও এখনো রেপড হয় নি, ওকে এখনো মেরে ফেলা হয় নি।'

'আমি কি ওকে এখন নিয়ে যেতে পারি ?'

'অবশ্যই। তার আগে আপনাকে একটা কাগজে সই করতে হবে। চা এসেছে, চাটা খেয়ে নিন।'

চেয়ার ছেড়ে ওসি সাহেব কোথায় যেন গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এসে বললেন, 'আপনি আর আপনার স্ত্রীতো ওকে ঘরে রেখে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে গিয়েছিলেন। আপনারা ফিরে এসেও দেখেন ঘরে তালা লাগানো ঠিকই আছে, কিন্তু ঘরে ও নেই। আপনি গেইজ করতে পারেন ও তাহলে ঘর থেকে বের হলো কীভাবে ?'

আমি অস্ফুট স্বরে বলি, 'কীভাবে ?'

'আপনাদের ঘরের দুটো চাবি— একটা আপনার কাছে থাকে, আরেকটা থাকে আপনার স্ত্রীর কাছে।'

'জি।'

'ও অনেকদিন ধরেই পালানোর চিন্তা করছিল এবং সুযোগ খুঁজছিল। কাল রাতে ও সুযোগটা পেয়ে যায়। আপনারা একটা চাবি নিয়ে বাইরে যান, আরেকটা চাবি রেখে যান ঘরে। খুব চালাক মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বুদ্ধি বের করে ফেলে। আপনার টিএন্ডটি থেকে পাশের বাসার টিএন্ডটিতে ফোন করে ও। ফোন করে পাশের বাসার মহিলাকে কী বলেছেন জানেন ?'

'কী ?'

'আপনি নাকি অফিস থেকে বাসায় এসেছেন, কিন্তু নিচের গেটের চাবি নাকি আপনার কাছে নেই, চাবিটা ঘরে রয়েছে, নিচের গেটটা খুলে দিতে হবে। আপনার স্ত্রীও নাকি কোথায় বেড়াতে গেছেন ওকে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে। মহিলাকে কৌশলে আপনার ঘরের সামনে ডেকে এনে আপনাদের রেখে যাওয়া চাবিটা দরজার নিচ দিয়ে বের করে দেয় এই মেয়েটা। মহিলাটি সরল বিশ্বাসে বাইরে থেকে খুলে দেয় আপনার ঘরের দরজাটা। তারপর যা হওয়ার হয়ে গেছে। বড় ধূর্ত মেয়ে রাহাত সাহেব, বিপদজনকও। বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন আপনি। ভাগ্যিস, খুঁজে পাওয়া গেছে ওকে।'

সাদা একটা কাগজে সই করে সুমীকে বাসায় নিয়ে আসি আমি। জীবনে কোনো কাজের মেয়ের গায়ে হাত তুলি নি আমি। সেই প্রথম এবং প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে একটা চড় মেরেছিলাম সুমীর গালে। পরের দিন ওদের বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ওকে।

তানজিকে নিয়ে আবার কোনো বিপদে পড়ব না তো! নিপাকে বললাম, 'ওকে ডাকো তো, আমি একটু কথা বলে দেখি।'

'না, এখন না। আরো একটু অবজার্ভ করে নেই ওকে।' নিপা চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'চাটা খেয়ে নাও, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

চায়ে চুমক দিতে দিতে আমি বললাম, 'রাতে তোমাকে নিয়ে একটু বাইরে যাব।'

'কোথায় যাব আমরা ?'

হায়াৎ রাস্তির সাহেবের কথা বলতে নিয়েই থেমে গেলাম আমি। বললাম, 'অন্যরকম একটা জায়গায় নিয়ে যাব তোমাকে।'

রাত নয়টার দিকে নিপা বলল তার শরীরটা ভালো লাগছে না। আজ বাইরে যাবে না। তারপর বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে। রাত বারোটার দিকে বাথরুম থেকে ঘুরে সে কী একটা কাজে বারান্দায় যায়। একটু পর দৌড়ে এসে চোখ বড় বড় করে কিছুটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'মোর্শেদ ভাই তাকিয়ে আছেন আমাদের বারান্দার দিকে।'

'কী!'

নিপা ফিসফিস করে আগের মতোই চোখ বড় বড় করে বলল, 'পাশের ফ্ল্যাটের মোর্শেদ ভাই তাকিয়ে আছেন।'

'এতরাতে তুমি তাকে কোথায় দেখলে ?'

'তাদের বাথরুমে।'

'বাথরুমে!'

'কাল তিনি বললেন না তাদের বাথরুম থেকে আমাদের বারান্দায় কাকে যেন লাফাতে দেখেছেন। কথাটা মনে হতেই তাদের বাথরুমের জানালার দিকে চোখ যায় আমার। প্রথমে বুঝতে পারি নি মোর্শেদ ভাই জানালা দিয়ে আমাদের বারান্দার দিকে তাকিয়ে আছেন। অন্ধকার বাথরুম, বোঝার কথাও না। একটু ভালো করে তাকাতেই মোর্শেদ ভাইয়ের চশমাটা চোখে পড়ে, রাস্তার লাইটপোস্টের আলো লেগে চশমাটা অল্প অল্প চকচক করছিল। আমাকে দেখেই মোর্শেদ ভাই মাথাটা নিচু করে ফেলেন। আমি তখন দরজার আড়ালে গিয়ে চুপি চুপি বাথরুমের দিকে তাকাই। একটু পর মোর্শেদ ভাই আবার মাথা উঁচু করেন, তাকিয়ে থাকেন আমাদের বারান্দার দিকে।' নিপা আমার হাত টেনে ধরে বলে, 'চলো, দেখবে।'

'না থাক। রাত অনেক হয়েছে ঘুমাও।'

বিছানায় শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিপা ঘুমিয়ে পড়ল। খুব সাবধানতা অবলম্বন করে আমি বিছানা থেকে নামলাম। তারপর পা টিপে টিপে বারান্দার দরজার আড়ালে দাঁড়ালাম আমি। ভালো করে মোর্শেদ সাহেবের বাথরুমের জানালার দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম— এখনো আমাদের বারান্দার দিকে তাকিয়ে আছেন মোর্শেদ সাহেব, গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন!

সকালে ঘুম ভাঙল মোর্শেদ ভাইয়ের বৌ রীতা ভাবির ডাকে। দ্রুত বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলেই দেখি কান্না কান্না চেহারা তার। সম্ভবত সারা রাত ঘুমান নি তিনি। সালাম দিয়ে আমি বললাম, 'কী খবর, ভাবি ?'

'আপনার কি ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম ?'

'না, এখনই উঠতাম।'

'দরজায় অনেকক্ষণ ধরে নক করছিলাম।' হঠাৎ দরজার পাশে তাকিয়ে বললেন, 'অ, আপনাদের তো কলিংবেল আছে, অযথা দরজায় নক করলাম। মাথাটা বোধহয় নষ্ট হয়ে গেছে আমার।'

'ভেতরে আসুন ভাবি।'

'ভেতরে যাব ?' ভাবি একটু দ্বিধা নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'লজ্জাই লাগছে, এত সকালে আপনাদের ডিস্টার্ব করছি।'

'লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই ভাবি। আপনি তো আর এমনি এমনি এত সকালে আমাদের বাসায় আসেন নি, নিশ্চয় কোনো কারণ আছে।'

'আপনার ভাই তো সারা রাত ঘুমায় নি, আমাকেও ঘুমাতে দেয় নি।'

'কেন ?'

'আপনাদের বারান্দায় কবে যেন কাকে লাফাতে দেখেছে। কাল সারা রাত তাকে দেখার জন্য বাথরুমের ভেতর ছিল ও, আমাকেও পাশে দাঁড় করে রেখেছিল সারা রাত।'

'আপনাকে কেন ?'

'কে লাফালাফি করে আমাকেও দেখাতে চেয়েছিল।'

'দেখেছেন আপনি তাকে ?'

'নাহ্। যত সব পাগলামি।' ভাবি রাগে গজগজ করতে করতে বলেন, 'সারা রাত ঘুম তো নষ্ট হয়েছেই, এরই মধ্যে বাথরুমে পড়ে মাথায় ব্যথাও পেয়েছেন আবার।'

'পড়ে গেলেন কীভাবে তিনি ?'

'পড়ে যাবে না, বাথরুমের জানালা দিয়ে এমনভাবে আপনাদের বারান্দায় বারবার তাকাচ্ছিল, কোনো দিকে খেয়াল ছিল না তখন। পায়ের নিচে পানি ছিল, পিছলে পড়ে গেছে।'

'মাথার কোথাও কেটে যায় নি তো?'

'তা যায় নি, তবে ব্যথাটা খুব বেশিই পেয়েছে। আর একটু হলে পানির ট্যাপের সাথে লাগত, তখন যে কী হতো আল্লায় জানে।'

নিপা চুলে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে ড্রইংরুমে আসতেই ভাবি শরমিন্দা মুখে বললেন, 'স্যরি ভাবি, আপনাদের বোধহয় ডিস্টার্বই করলাম। আরো একটু ডিস্টার্ব করব। এককাপ চা খাব ভাবি, দুধ ছাড়া চিনি কম। আমি আবার ঘুম থেকে উঠেই চা খাই তো। আজ চা খাওয়ারও সুযোগ হয় নি।'

'খালি পেটে চা খাবেন! দু পিস পাউরুটি দেই ভাবি?'

'না না, আমি সকালে চা খাওয়ার দু'ঘণ্টা পর নাস্তা করি। নাস্তাতে সাদা রুটি খাই ভাবি। সারা শরীরে অসুখ বেধে বসে আছে। যাই খাই তাতেই গ্যাস হয়। প্রেসার তো আছেই, ডায়াবেটিসও দেখা দিয়েছে অল্প একটু। আপনি শুধু চা-ই দেন ভাবি।'

নিপা ভেতরের ঘরে যেতেই ভাবি আমার দিকে একটু এগিয়ে বসে ফিসফিস করে বললেন, 'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, ব্যাপার কী বলুন তো ভাই। আপনার ভাই আপনাদের বারান্দায় কী দেখেছে?'

'আমার মনে হয় মোর্শেদ ভাই কিছুই দেখেন নি। কোনো ছায়া-টায়া হয়তো দেখেছেন।'

'ছায়া-টায়া দেখলে তো এমন করার কথা না। একটা বাচ্চা ছেলেকে নাকি নাচতে দেখেছে। আপনি তো জানেন আমাদের কোনো ছেলে মেয়ে নেই। কম তো চেষ্টা করলাম না। এত বছর হয়ে গেলে হবেও না বোধহয়। আপনার ভাই ছোট কোনো বাচ্চা দেখলেই কেমন যেন হয়ে যায়। এমনভাবে তাকে আদর করে, মনে হয় সেটা অন্যের বাচ্চা না, নিজের বাচ্চা। মানুষটার এরকম পাগলামি দেখে চোখে পানি এসে যায় ভাই। প্রবলেম তো আমার। কতবার বললাম আরেকটা বিয়ে করো। তাও করবে না।'

'ভাবি, ভাইয়ের মনে সব সময় একটা বাচ্চার আকাঙ্ক্ষা আছে তো, তাই তার চোখে সব সময় বাচ্চাই ভাসে। আমার মনে হয় আমাদের বারান্দাতেও তিনি সেরকম একটা কিছু দেখেছেন।'

'কিন্তু তাকে এটা বুঝাবে কে? তার বধ্যমূল ধারণা সে বারান্দাতে একটা বাচ্চাই দেখেছে। সময় সুযোগ পেলে আপনি আমার বাসায় এসে একবার দেখে

যেয়েন, সারা ঘর বাচ্চাদের ছবি দিয়ে ভরে ফেলেছে। মাঝে মাঝে এমন সব কাণ্ডকারখানা করে না, প্রচণ্ড অপরাধে ভুগি তখন।'

আর কোনো কথা না বলে রীতা ভাবি হঠাৎ উঠে চলে যান। সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কাপ হাতে নিপা ঘরে ঢুকে বলে, 'ভাবি কই ?'

'চলে গেছেন।'

নিপা আমার পাশে বসে বলে, 'কোনো প্রবলেম ?'

'মোর্শেদ ভাই নাকি সারারাত বাথরুমে ছিলেন।'

'আর তাকিয়ে ছিলেন আমাদের বারান্দায়, না ?'

'তিনি একা শুধু তাকিয়ে থাকলে তো ভালোই ছিল, ভাবিকেও সঙ্গে করে দাঁড়িয়ে ছিলেন।'

ভাবির জন্য আনা চা'টা খেতে লাগল নিপা। খুব আয়েস করে চা খাচ্ছে। এ মুহূর্তে ওকে দেখে মনে হচ্ছে, পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ ও। কী নির্ভার, কী নিশ্চিত!

'চা'টা খুব মজা হয়েছে, না ?'

'ঠিক মজা না, অন্যরকম লাগছে। খালি পেটে চা খেতে তো ভালোই লাগে, আর দুধ ছাড়া চায়েরও অন্যরকম একটা মজা আছে। তোমার জন্য এক কাপ বানিয়ে আনি ?'

'না, আমার চা খেতে ইচ্ছে করছে না।' নিপার দিকে তাকাই আমি। নিপা আগের মতোই আয়েস করে চা খাচ্ছে। আমি ওর পায়ের ওপর একটা হাত রেখে বলি, 'তুমি কী একটা জরুরি কথা বলতে চেয়েছিলে আমাকে ?'

'কখন ?'

'ওই যে পরশু রাতে।'

'জরুরি কথা—।' নিপা কী একটা মনে করতে চেষ্টা করে। বেশ কিছুক্ষণ পর ও বলে, 'না, মনে করতে পারছি না। তবে তোমাকে যা বলতে চাই তাই আমার কাছে এখন জরুরি মনে হয়।' নিপা খিলখিল করে হেসে ওঠে, কোনো কারণ নেই, হঠাৎই। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে হাসতে থাকে ও। আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেছে, তবু হাসি শেষ হয় না ওর। এ মুহূর্তে ওর হাসিটা অপ্রকৃতিস্থের মতো মনে হয় আমার, কেমন যেন পাগল পাগল লাগছে ওকে।

নিপা আবার হঠাৎ হাসিটা থামিয়ে ফেলে। আমার দিকে খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে বলে, 'তুমি কি সত্যি সত্যি একটা বাচ্চার কথা শুনতে পাও ?'

'কেন, তোমার বিশ্বাস হয় না?'

'বুঝতে পারি না, রাহাত।' নিপা আমার একটা হাত খামচে ধরার মতো ধরে বলে, 'বাচ্চার গলার স্বরটা কী খুব মিষ্টি?'

'খুব মিষ্টি।'

'আমার গলার স্বরের মতো?'

'বাচ্চার গলা তো, তাই ঠিক বোঝা যায় না। তবে তোমার গলার মতোই মিষ্টি মনে হয়।'

নিপা উদাস হয়ে একবার আমার দিকে তাকায়। তারপর মাথাটা নিচু করে তাকিয়ে থাকে মেঝের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে তাকিয়ে থাকার পর ও আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে, আগের চেয়ে শব্দ করে, আগের চেয়ে উৎফুল্ল হয়ে। ওর হাতে চায়ের কাপটা ছিল, হাসতে হাসতে সেটা পড়ে যায় মেঝের ওপর, ভেঙে গিয়ে সেটার টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়ে সারা মেঝেতে। তাই দেখে ও আরো হেসে ওঠে। আমি নিপার একটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলি, 'এই নিপা, কী হয়েছে তোমার?'

হঠাৎ করেই নিপা হাসি থামিয়ে দিয়ে বলে, 'কই?'

'এভাবে হাসছো যে।'

'হাসি আসছে হাসব না!'

'কিন্তু তাই বলে মানুষ এভাবে হাসে!'

'সবাই হাসে না, কেউ কেউ হাসে।' নিপা আবার হাসতে নিয়েই থেমে যায়। আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আচ্ছা, কাল রাতে তুমি যেন কোথায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলে আমাকে?'

'একটা অন্যরকম জায়গায়।'

'অন্যরকম জায়গাটা কোথায়?'

'গেলেই দেখতে পাবে।'

'আজ নিয়ে যাবে সেখানে?'

'হ্যাঁ, দশটার দিকে যাব। তারপর অদ্ভুত একটা লোকের পরিচয় করিয়ে দেব তোমাকে। তার আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।'

নিপা খুব আগ্রহ নিয়ে বলে, 'কী?'

ওয়ারড্রোবের ওপর রাখা হায়াৎ রাস্তির দেওয়া ফর্মটা এনে নিপার হাতে দেই আমি। নিপা সেটা হাতে নিতে নিতে বলে, 'এটা কী?'

'পড়ে দেখো।'

নিপা দ্রুত ফর্মটা পড়া শেষ করে বলে, 'এটা দিয়ে কী হবে?'

'তোমাকে আর আমাকে পূরণ করতে হবে।'

'কেন?'

'আমি ঠিক জানি না কেন?'

'আমরা দুজন মিলে একটা ফর্ম পূরণ করব?'

'না, দুজনে দুটো ফর্ম পূরণ করব। কিন্তু কারো ফর্ম পূরণ করা কেউ দেখতে পারব না। ইনডিভিজুয়ালি যার যারটা তার তার পূরণ করতে হবে।'

'তোমার ফর্ম কই?'

'আছে।'

'দুটো ফর্ম একই?'

'একই।'

'দেখি তো তোমার ফর্মটা।'

নিপা দুটো ফর্মই একসঙ্গে পড়তে থাকে। একবার এ ফর্মের দিকে তাকায়, আরেকবার ও ফর্মের দিকে তাকায়। পড়া শেষ হতেই হাসতে হাসতে বলে, 'এসব কী লিখেছে!'

'কী লিখেছে?'

'তুমি পড়ো নি ফর্মটা?'

'পড়েছি।'

'ফর্ম পূরণ করব কী, আমার তো তার আগেই হাসি আসছে।' কথাটা বলেই নিপা খিলখিল করে হাসতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ হাসার পর ও বলে, 'এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়?' নিপা হঠাৎ থেমে গিয়ে আমার দিকে খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে বলে, 'আচ্ছা, আমাকে এ ফর্মটা পূরণ করতে হবে কেন? সমস্যাটা—।' কথাটা শেষ করতে পারে না নিপা, সামনের দিকে তাকায় ও। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও সামনের দিকে তাকাই। পাশের ঘর থেকে তানজি এ ঘরে এসেছে। বিশাল একটা পুতুল জড়িয়ে ধরে আছে ও। পুতুলটা প্রায় ওর সমানই। নিপা দ্রুত উঠে গিয়ে তানজির হাত থেকে পুতুলটা নিয়ে বলল, 'এটা কোথায় পেয়েছিস তুই?'

'ঘুম থেকে উঠে দেখি বিছানার পাশে পড়ে আছে এটা।'

'বিছানার পাশে পড়ে আছে! বিছানার পাশে কোথায়?' তানজিকে টানতে টানতে নিপা পাশের ঘরে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাই।

'এই যে এখানে।' তানজি ওর বিছানার পাশটা দেখায়।

'এখানে এটা আসল কীভাবে ?'

'আমি জানি না।'

নিপা ভয় ভয় চোখে আমার দিকে তাকায়। আমি ওকে শান্ত হওয়ার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করি, ও তবুও শান্ত হয় না। উত্তেজনায় ঘনঘন নিশ্বাস নিতে থাকে ও। তানজিসহ নিপাকে আমাদের বেডরুমে নিয়ে আসি আমি। তারপর বিছানায় নিপাকে শা— করে বসিয়ে তানজির দিকে তাকিয়ে বলি, 'তানজি, তুই সত্যি করে বল তো, এটা তুই কোথায় পেয়েছিস ?'

স্পষ্ট স্বরে তানজি বলে, 'বিছানায়।'

'সত্যি বলছিস তো তুই ?'

মাথা উপর-নিচ করে তানজি।

বেশ দূরে দাঁড়িয়ে ছিল তানজি। ইশারা করতেই কাছে এসে দাঁড়ায় ও। আমি ওর কাঁধে একটা হাতে রেখে বলি, 'এটা কি তোকে কেউ দিয়েছে ?'

এবার মাথাটা এদিক-ওদিক করে তানজি।

'মাথা নাড়াতে হবে না, কথা বল। তোকে কি এই পুতুলটা কেউ দিয়েছে ?' তানজির চোখের দিকে তাকিয়ে বলি আমি।

'না।' তানজি আগের মতোই স্পষ্ট স্বরে বলে।

'আগের আরেকটা পুতুল ?'

'ওটাও কেউ দেয় নি।'

'তাহলে তুই এগুলো পাচ্ছিস কোথায় ?'

'আগেরটা আপু বাক্সের ভেতর থেকে বের বের করেছিল, আর এটা পেয়েছি বিছানার পাশে।'

'সত্যি বলছিস তো তুই ?'

'হ্যাঁ।'

'তুই ভালো করে মনে করে দেখ— দিনেরবেলা কিংবা রাতেরবেলা কেউ কি এ পুতুলগুলো তোকে দিয়েছে ?'

'না।'

তানজির দিকে আমি আরো ভালো করে তাকাই, 'আচ্ছা, রাতেরবেলা তোর কাছে কি কেউ আসে ?'

মাথা নিচু করে ফেলে তানজি, কিছু বলে না। আমি আরো মনোযোগ দিয়ে ওর দিকে তাকাই। ওকে বোঝার চেষ্টা করি। ও মাথা নিচু করেই আছে। পা দিয়ে মেঝেটা খুঁটছে। মনে হচ্ছে, কী যেন চিন্তা করছে ও, গভীর চিন্তা।

'বল।'

কিছুটা চমকে উঠে নিপা মাথাটা তুলে আমার দিকে তাকায়, কিন্তু কোনো কথা বলে না। ভাবলেশহীন তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। ওর চোখের মণি দুটো স্থির, চোখের পাতাগুলোও স্থির। একটুও নড়াচড়া করছে না।

'কী হলো বল— রাতেরবেলা তোর কাছে কি কেউ আসে?'

মাথা উপর-নিচ করে তানজি।

'তোকে বলছি না মাথা নেড়ে কিছু বলবি না, মুখে বল।'

'আসে।'

'আসে!' নিপা চিৎকার করে বলার মতো করে বলে, 'কে আসে?'

নিপা উত্তেজিত হয়ে গেছে। আমি ওকে শান্ত করার চেষ্টা করি। ও কেমন যেন হাঁপাতে থাকে। হঠাৎ করে ও হেসে ওঠে। কোনো কারণ নেই, এমনি। সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে ও হাসতে থাকে। কিছুক্ষণ পর ও গোঙাতে থাকে। গোঙাতে গোঙাতে কী যেন বলে, কিন্তু বোঝা যায় না কিছুই। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ওর। বিছানায় শুয়ে দেই আমি ওকে। তানজি দৌড়ে এসে নিপার মাথা চেপে ধরে ডাকতে থাকে-আপু, আপু। নিপা কিছু বলে না। ঘুমিয়ে পড়েছে ও, গভীর ঘুম।

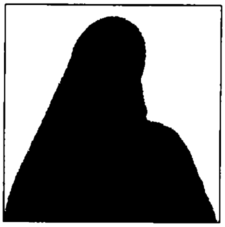

দরজা খুলেই হায়াৎ রাস্তি সাহেব তাকিয়ে রইলেন আমাদের দিকে। তার তাকানো দেখে মনে হচ্ছে তিনি আমাকে চিনতে পারছেন না, নিপাকে এই প্রথম দেখলেন, সুতরাং ওকে চেনার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। কিছুটা বিব্রতকর অবস্থা। আমি খুক করে একটু কেশে নিয়ে বললাম, 'সম্ভবত আমাকে চিনতে পারছেন না, স্যার।'

'আপনার ধারণাটা সঠিক, আপনি?' নাকের ওপর নেমে আসা চশমাটা একটু উপরে তুললেন তিনি। তারপর ভাঙা ডাটে লাগানো সুতাটা কানের সঙ্গে ভালো করে পেঁচিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন আবার।

'গতকাল আপনার কাছে এসেছিলাম।'

'গতকাল তো আমার কাছে কতজনই এসেছে।'

'ওই যে আমার সঙ্গে একটা মেয়ে এসেছিল।'

চুলকাতে চুলকাতে মাথাটা নিচু করে ফেললেন হায়াৎ রাস্তি সাহেব। একটু পর কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'অ, চিনতে পেরেছি আপনাকে। একটা বাচ্চার কথা শোনেন আপনি, না?'

ঝট করে নিপার দিকে একবার তাকিয়ে হায়াৎ রাস্তির দিকে ফিরে তাকিয়ে বলি, 'জি।'

'কিন্তু আপনার তো কাল রাতে আসার কথা ছিল।'

'জি। একটা অসুবিধার কারণে আসতে পারি নি।'

'কিন্তু আমার যে এখন অসুবিধা। কাল রাতে ভালো ঘুম হয় নি, আমি এখন একটু ঘুমাব। তারপর ঘুম থেকে উঠে একটা ধাঁধার সমাধান করব।'

'আমরা কি এখন তাহলে চলে যাব, স্যার?'

হায়াৎ রাস্তি সাহেব এই প্রথম নিপার দিকে তাকালেন। তাৎক্ষণিকভাবে কী একটা ভেবে বললেন, 'ইনি তো আপনার স্ত্রী?'

'জি।'

'মেয়েদের তো আমরা সম্মান কম করি। তার সম্মানে অন্তত আপনাদের সঙ্গে এখন কিছু কথা বলা উচিত। ভেতর আসুন।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব দরজা থেকে

সরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনারা ওই চেয়ার দুটোতে বসে কিছুক্ষণ গল্প করুন। আমার চেয়ারে বসে আমি জাস্ট পনের থেকে বিশ মিনিট একটা ঘুম দেব। তারপর ধাঁধার সমাধানটা করতে করতে আপনাদের সঙ্গে কথা বলব। ভালো কথা, আপনাদের সঙ্গে কোনো মোবাইল আছে নাকি ?'

'জি।'

'সেটা বন্ধ করে রাখবেন, প্লিজ। এই যন্ত্রটার শব্দ একবার কানে গেলে আমার আর ঘুম আসবে না। বড্ড বিরক্তিকর।'

নিপার আর আমার মোবাইল দুটো বন্ধ করে চেয়ারে বসতেই হায়াৎ রাস্তি সাহেব বললেন, 'আপনাদের চা খাওয়ার অভ্যাস আছে তো ?'

'জি।'

'পাশের রুমে গ্যাসের চুলা, চা, চিনি, পানি সব আছে। আপনারা ইচ্ছে করলে চা বানিয়ে খেতে পারেন। চা অবশ্য আমি কম খাই, সেটা আবার দুধ চা না, দুধ ছাড়া চা। দুধ ছাড়া চা আপনাদের চলবে তো ?' নিজের চেয়ারে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসতে বসতে হায়াৎ রাস্তি সাহেব বললেন।

'জি স্যার, চলবে।'

'অনেকের মতো আপনিও আমাকে প্রথম থেকেই স্যার স্যার বলছেন, শুনতে ভালো লাগছে আমার। যদিও আমার জীবনে আমি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ কিংবা স্কুলে শিক্ষকতা করি নি। অবশ্য অপ্রচলতিভাবে আমি কিছু কিছু ছেলে মেয়েকে পড়াই, সে প্রসঙ্গে পড়ে কথা বলব।'

'কিন্তু স্যার আমরা তো জানি আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাইকোলজিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, সেখানে আমার চাকরিও হয়েছিল, কিন্তু করা হয় নি।'

'কেন স্যার ?'

'কেন ?' হায়াৎ রাস্তি সাহেব আর কিছু বললেন না, চুপ হয়ে রইলেন। একটু পর খেয়াল করি অল্প অল্প নাক ডাকছে তাঁর। ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি।

নিপা ইশারা করে ঘরের ভেতরের কুকুরটাকে দেখিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ওটা ঘরের ভেতর কেন ?'

ফিসফিস করে আমিও বললাম, 'জানি না।'

'বিড়াল, কাক, মাছ, পাখিও দেখছি। ওটা কী পাখি ?'

'ময়না।'

'ময়না তো কথা বলতে পারে। ওটা বলতে পারে নাকি ?'

'শুধু পারে না, প্রশ্নের জবাবও দেয়।'

'তাই নাকি ?' নিপা বেশ উৎসাহী হয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি ওটার সঙ্গে একটু কথা বলব।'

'কী কথা বলবে ?'

'জানি না। যা মনে আসে তাই বলব।' নিপা নিঃশব্দে ময়নাটার দিকে এগিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও গেলাম। কুকুরটার সামনে দিয়ে যেতেই লেজ নাড়াতে নাড়াড়ে লাগল সেটা। নিপা তাই দেখে থমকে দাঁড়াল। সাহস করে কুকুরটার মাথায় হাত রাখল সে। আদর টের পেল কুকুরটা, আলতো করে চেটে দিল নিপার হাতটা। নাদুস-নুদুস বিড়ালটা ফাঁকে এক জায়গায় বসে ছিল, এগিয়ে এলো সেটা নিপার দিকে। হাত বাড়ালো ও, সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালটা কোলো উঠে বসল নিপার। নিপা নিঃশব্দে হেসে বলল, 'বাব্বাহ, ওজনও আছে বিড়ালটার!'

বিড়ালটাকে কোলে নিয়েই নিপা ময়নাটার খাঁচার কাছে গেল। ঘাড় কাত করে নিপাকে এক পলক দেখে নিল ময়নাটা। তারপর কু কু করতে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বলল, 'মিনা, ভালো আছো ?'

কিছুটা চমকে উঠে নিপা আমার দিকে তাকাল, 'মিনাটা কে ?'

'নিশ্চয় তুমি না।'

'তাহলে ?'

'সম্ভবত তোমার কোলের বিড়ালটার নাম।'

'মিনা, ভালো আছো ?' ময়নাটা আবার ডানা ঝাপটিয়ে বলল।

বিড়ালটা এবার মাথা উঁচু করে ময়নাটাকে দেখে ম্যাও করে উঠল একবার। তারপর নিপার কোল থেকে নেমে সামনের কাঠের টেবিলটার ওপরে গিয়ে বসল। নিপা খাঁচাটা ধরে ময়নার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার নাম কী ?'

'ময়না ময়না।'

'ময়না ময়না না, শুধু ময়না ?'

ময়নাটা এবার চেঁচানোর মতো করে একনাগাড়ে বলতে লাগল, 'ময়না ময়না ময়না ময়না ময়না... ।'

'বুঝেছি বুঝেছি।' নিপা ময়নাটাকে থামিয়ে বলল, 'তুমি কী খেতে পছন্দ করো, ময়না পাখি ?'

কিছু বলল না ময়নাটা। কেবল কু কু করতে লাগল।

টেবিলের ওপর রাখা ভেজা ছোলার দিকে একবার তাকিয়ে ময়নার দিকে তাকিয়ে নিপা বলল, 'ছোলা খেতে পছন্দ তোমার ?'

ময়নাটা আগের মতো চেঁচিয়ে বলল, 'ছোলা ছোলা ছোলা ছোলা... ।'

'ওকে ওকে।' নিপা হাসতে হাসতে বলে, 'তোমার কি ঘুম পেয়েছে ?'

'মামা ঘুমায় মামা ঘুমায় ।'

'কে তোমার মামা ?' চেয়ারে ঘুমিয়ে থাকা হায়াৎ রাস্তির দিকে তাকিয়ে নিপা বলল, 'উনি তোমার মামা ?'

'মামা মামা মামা মামা... ।' ময়নাটা চেঁচাতে থাকে।

'বুঝতে পেরেছি উনি তোমার মামা। আচ্ছা বলো তো, আমি কে ?'

'মানুষ মানুষ ।'

'আমি মানুষ!' নিপা আনন্দে হাসতে হাসতে বলল, 'বলো তো, আমি কেমন মানুষ ?'

'মানুষ মানুষ মানুষ মানুষ... ।' ময়নাটা ডানা ঝাপটায় আর বলে। এ মুহূর্তে পাখিটাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব আনন্দে আছে সে।

'থ্যাংক ইউ, ময়না পাখি ।'

'ওয়েল কাম ।'

চোখ বড় বড় করে নিপা ময়নাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি নিপার কাঁধ ছুঁয়ে বলি, 'চোখ বড় বড় করার কিছু নেই। এ সবই শেখানো বুলি। দেখলে না, তোমার সব কথার উত্তর দিতে পারল না ও। হায়াৎ রাস্তি সাহেব ওকে যা শিখিয়েছেন ও কেবল তাই বলতে পারে।'

কাকটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে নিপা আমাকে বলে, 'আমাকে একটা ময়না কিনে দেবে ?'

'ময়না দিয়ে কী করবে তুমি ?'

'কথা বলা শেখাব ওকে, লেখাপড়াও শেখাব আমি ওকে।' নিপা গলাটা বিষাদ করে বলে, 'আমার কপালে তো বোধহয় কিছু নেই, এসব পাখি-টাখির সঙ্গেই কথা বলতে হবে, গল্প করতে হবে।' কথাটা শেষ করেই নিপা হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে কাকটার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'একটা কাকও কিনে দিও আমাকে। আচ্ছা, তুমি কি জানো প্রাণীদের মধ্যে কাকই সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং চালাক ?'

কাকটাকে দেখতে দেখতে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, কোনো একটা ইউনিভার্সিটির বিশেষজ্ঞরা নাকি পরীক্ষা করে দেখেছেন কাকই সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী। শেয়াল এবং বানরও তার চেয়ে কম বুদ্ধিমান।'

'দেখেছো, কাকের গা কত মসৃণ!'

'চোখ দুটোও দেখো, কী টলটলে!' নিপার দিকে তাকিয়ে বলি, 'তোমার চোখের মতো।'

'আমার চোখের চেয়েও সুন্দর।' নিপা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমার এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছে, চলো চা বানাই।'

আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে চেয়ারে ঠেস দেওয়া থেকে উঠে বসলেন হায়াৎ রাস্তি সাহেব। সামনে রাখা টেবিল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পুরো বাইশ মিনিট ঘুমালাম। অবশ্য আরো একটু ঘুম হতো। আপনাদের কথায় ঘুমটা ভেঙে গেল হঠাৎ।'

'স্যরি।'

'না, স্যরি হওয়ার কিছু নেই। ঘুমটা ভেঙে ভালোই হয়েছে। ধাঁধার সমাধানটা বের করা দরকার। যতক্ষণ এটার সমাধান বের করতে না পারব ততক্ষণ মাথার ভেতর কুট কুট করতে থাকবে এটা?' মাথা চুলকাতে চুলকাতে হায়াৎ রাস্তি সাহেব বললেন, 'আপনাদের মনে নিশ্চয় প্রশ্ন জেগেছে আমার ঘরে কুকুর-বিড়াল-কাক-টাক কেন?'

নিপা উৎসাহী হয়ে বলল, 'জি।'

'কিছু মনে করবেন না। আমার এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু বানাতে ইচ্ছে করছে না। আপনি কি আমাকে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়াবেন? যদিও আমার এখানে এসেছেন আপনারা, আমারই বানিয়ে খাওয়ানো উচিত।'

'না না, ঠিক আছে। আমাকে তো প্রায়ই চা বানাতে হয়।' করার মতো একটা কাজ পেয়েছে এরকম উৎসাহ নিয়ে নিপা পাশের ঘরে দিকে এগিয়ে যেতেই হায়াৎ রাস্তি সাহেব বললেন, 'চা কিন্তু আপনাদের জন্যও বানাবেন।'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কাঠের টেবিলটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হায়াৎ রাস্তি সাহেব বললেন, 'ময়নাটাকে কয়েকটা ছোলা দেওয়া দরকার।' কাচের বাটিটা থেকে কয়েকটা ছোলা হাতে নিলেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো আগের জায়গায় রেখে দিয়ে বললেন, 'না, ওকে এখন ছোলা দেওয়া যাবে না। অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে। ও আগে প্রশ্নের উত্তর দেবে, তারপর ছোলা দেব ওকে।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব আমার দিকে তাকালেন, 'জানেন, ওকে অদ্ভুত কিছু নতুন জিনিস শিখিয়েছি আমি।'

'কালকে যেগুলো শুনেছিলাম, সেগুলোও তো অদ্ভুত ছিল।'

'আজকেরগুলো আরো অদ্ভুত এবং মজার।'

'কয় দিন লেগেছে এগুলো শেখাতে?'

'কাল রাত বারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত শিখিয়েছি।'

'এত অল্প সময়ের মধ্যে পাখিটা শিখে ফেলেছে ?'

'ঠিক শিখে ফেলেছে কিনা সেটাই এখন পরীক্ষা করব। ও অবশ্য একদিনেই অনেক কিছু শিখে ফেলে। অনেক ব্রেনি একটা পাখি।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব পাখিটার দিকে এগিয়ে যেতে নিতেই পাশের ঘরের দরজার দিকে তাকান, 'চা হয়ে গেছে!'

'চা বানানো তো কঠিন কিছু না, সহজেই বানানো যায়।' টেবিলে চায়ের কাপগুলো রেখে হাসতে হাসতে বলে নিপা।

'তাই ?' মুচকি হেসে একটা কাপ হাতে নিয়ে তাতে চুমক দিয়ে হায়াৎ রাস্তি সাহেব বলেন, 'এ পৃথিবীর কোনো কিছুই কঠিন নয়, এমন কি নিজেকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা কিংবা ধ্বংস্ব করাও কঠিন না।'

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে ময়নাটার দিকে এগিয়ে গেলেন হায়াৎ রাস্তি সাহেব। খুব আয়েশ করে চায়ে চুমুক দিয়ে ময়নাটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলো তো ময়না মামা, মানুষ স্বপ্ন দেখে কেন ?'

ময়নাটা একবার পাখা ঝাপটিয়ে বলে, 'ফ্রি দেখা যায় তো, তাই।'

নিপা ফিক করে হেসে উঠে, শব্দহীন হাততালিও দিয়ে ফেলে কয়েকটা। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'একেবারে দুষ্টু মানুষের মতো কথা বলছে পাখিটা।'

হায়াৎ রাস্তি সাহেবের মুখেও মুচকি হাসি। চায়ের চুমক দিতে দিতে তিনি বলেন, 'আমরা চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, হাত দিয়ে কাজ করি, পা দিয়ে হাঁটি আর মুখ দিয়ে ?'

ময়নাটা ঘাড় কাত করে হায়াৎ রাস্তির দিকে তাকায়, কিছু বলে না। হায়াৎ রাস্তি সাহেব গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকেন ময়নাটা দিকে, ময়নাটা তবু কিছু বলে না। তিনি আরো এগিয়ে যান খাঁচাটার দিকে, 'ভুলে গেছ, মামা ? একটু চেষ্টা করো, সব মনে পড়বে।'

ময়নাটা আবার ঘাড় কাত করে। দেখে মনে হচ্ছে কথাটা মনে করার চেষ্টা করছে সে। একটু পর ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বলে, 'চাপা মারি।'

'গুড। এই তো লক্ষ্মী মামা।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব খুব উৎসাহ নিয়ে বলেন, 'মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মের মাধ্যমে, খারাপ মানুষ বেঁচে থাকে ?'

'কুকর্মের মাধ্যমে।'

'ভেরি গুড।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কেমন লাগছে, বলুন তো?'

আমার আগেই নিপা উৎফুল্ল হয়ে বলে, 'অদ্ভুত'।

আগের চেয়ে উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে হায়াৎ রাস্তি সাহেব পাখিটিকে এবার বলেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ উত্তর কোনটি?'

'জানি না।'

হায়াৎ রাস্তি সাহেবের মুখটা হাসিতে ভরে উঠেছে, 'ইয়েস, মানুষকে আজকাল কোনো কিছু বললেই বলে— জানি না। মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ উত্তর এটা। কোনো কিছুই ইদানীং জানতে চায় না মানুষ, জানবে কী করে, জানার ইচ্ছে থাকলে তো!' হায়াৎ রাস্তি সাহেব পাখিটিকে এবার বলেন, 'অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে পার্থক্য কী, বলো তো মামা?'

ময়নাটি ঘাড় কাত করে, কিছু বলে না।

'ভুলে গেছ?' হায়াৎ রাস্তি সাহেব মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলেন, 'আরেকবার চেষ্টা করো তো, মামা?'

পাখিটি আবার মাথা কাত করে। হায়াৎ রাস্তি সাহেব খাঁচাটা ধরে বলেন, 'কঠিন প্রশ্ন, উত্তরটাও কঠিন। ভুলে যাওয়ারই কথা। প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে— অতীতটা আমরা ভুলে যাই, বর্তমানটা কাটে আমাদের কষ্টে আর আমাদের ভবিষ্যৎ যথারীতি অন্ধকার।'

সঙ্গে সঙ্গে ডানা ঝাপটিয়ে বলে ওঠে, 'অতীতটা আমরা ভুলে যাই, বর্তমানটা কাটে আমাদের কষ্টে আর আমাদের ভবিষ্যৎ যথারীতি অন্ধকার।'

'আমরা কিসে বাঙালি?'

'হুজুগে বাঙালি।' ময়নাটি বলে।

'এবার বলো তো মামা— ভীতি আর নীতির মধ্যে পার্থক্য কী?'

'ভীতি থাকলে নীতি থাকে না, নীতি থাকলে ভীতি থাকে না।'

'চমৎকার মামা, চমৎকার।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব হাততালি দিতে দিতে বলেন, 'বলো তো, কোন জিনিসটা না চাইলেও সবাই দিতে পছন্দ করে?'

'উপদেশ উপদেশ।' ক্লাসের ভালো ছাত্রের উত্তর দেওয়ার মতো ময়নাটাও ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উত্তর দেয়।

চায়ের কাপে শেষ চুমক দিয়ে কাপটা টেবিলে রেখে হায়াৎ রাস্তি সাহেব ময়নাটার দিকে তাকান। মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন তিনি পাখিটির দিকে। তারপর মুচকি হাসতে হাসতে বলে, 'এবার একটা অঙ্কের উত্তর দাও তো

মামা— দুইয়ে দুইয়ে কত হয় ?'

'যোগ কিংবা গুণ করলে চার, ভাগ করলে এক, বিয়োগ করলে শূন্য আর পাশাপাশি থাকলে বাইশ।'

শব্দ করে হেসে ওঠে নিপা। হায়াৎ রাস্তি সাহেব কিছুটা গর্বিত ভঙ্গিতে তার চেয়ারে এসে বসেন। তারপর নিপার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম আপনি তখন ময়নাটা সঙ্গে কথা বলেছেন, না ?'

নিপা অস্ফুট স্বরে বলে, 'জি।

'যখন একা থাকি, আমিও তখন ওর সঙ্গে কথা বলি। বলতে পারেন ও আমার গল্পের সঙ্গী।'

'আপনার আর কোনো গল্পের সঙ্গী নেই ?'

'ছিল।'

'ছিল মানে ?' নিপা একটু ঝুঁকে বসে আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'পরে বলি। তার আগে অন্য কথা বলি। এই যে কুকুরটা দেখছেন. ও হচ্ছে আমার এই ঘরের সবচেয়ে বড় পাহারাদার। আমি এ পর্যন্ত তিনটা কাজের ছেলেকে রেখেছিলাম এখানে, তিনজনই টাকা-পয়সা চুরি করে পালিয়ে গেছে। তারপর থেকে আর কোনো ছেলেকে না, কুকুর পালি আমি। মানুষের চেয়ে ভালো, মানুষের চেয়ে বিশ্বাসী। আর ওই যে বিড়ালটা দেখছেন, ওর জন্য আমার ঘরে কোনো ইঁদুর থাকতে পারে না। ইঁদুরে আমার অ্যালার্জি আছে। আমি আরেকটা জিনিস সহ্য করতে পারি না, তা হলো মশা। ওই অ্যাকুরিয়ামটার উপরিভাগটা রাতে খুলে দেই আমি, তারপর একটা ওষুধ স্প্রে করি পানির ওপর। একটু পর ঘরের প্রায় সব মশা গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ওখানে। মাছগুলো তখন টপ টপ করে মশাগুলো খেয়ে ফেলে। আর ওই কাকটাকে পেয়েছি রাস্তায়। একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা পাখির বাচ্চা পড়ে আছে, আগের রাতে ঝড় হয়েছিল তো, তাই হয়তো কোনো গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল। ঘরে নিয়ে এসে বড় করতে থাকি, কয়েকদিন পর বুঝতে পারি কাকের বাচ্চা এটা, যার একটা ডানা ভাঙা। উড়তে পারে না তাই। মাঝে মাঝে ওড়ার চেষ্টা করতেই এখানে ওখানে পড়ে থাকে, তাই ওর পাটা বেঁধে রাখা হয়েছে।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব হাসতে হাসতে বলেন, 'জানেন তো, কাক অনেক বুদ্ধিমান প্রাণী। মানুষও বুদ্ধিমান। তবে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে মানুষের সঙ্গে সবসময় থাকার চেয়ে একটা কাকের সঙ্গে থাকা ভালো।' দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে হায়াৎ রাস্তি সাহেব বলেন, 'এই হচ্ছে ঘরে পশুপাখি রাখার আমার শানে নুযুল। ভালো কথা, আপনারা তো অনেকক্ষণ ধরে এসেছেন, আপনাদের সমস্যাটা নিয়ে কোনো কথাই হলো না।

আমার মাথায় একটা ধাঁধা ঘুরছে, মনে হচ্ছে সেটার সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত কোনো কিছুতে মনোনিবেশ করতে পারব না আমি। আচ্ছা, আপনাদের দুটো ফর্ম দিয়েছিলাম, পূরণ করে এনেছেন সে দুটো?'

'জি।' ব্যাগ থেকে ফর্ম দুটো বের করে হায়াৎ রাস্তির হাতে দেই আমি। তিনি একবার চোখ বুলিয়ে ফর্ম দুটো পাশে রেখে বলেন, 'কাল রাতে আপনি বাচ্চাটার কথা শুনেছেন?'

'না।'

'উনি তো আপনার স্ত্রী।' হায়াৎ রাস্তি নিপার দিকে তাকিয়ে আবার আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আপনার সমস্যাটা ওনার সঙ্গে শেয়ার করেছেন?'

'না, ঠিক সময়-সুযোগ হয়ে ওঠে নি।'

'আজই ওনাকে সব কথা খুলে বলবেন। আর এখন আর আপনাদের সঙ্গে কোনো কথা বলব না আমি। আপনাদের পূরণ করা ফর্ম দুটো আমি একটু অবজার্ভ করব, তারপর আমি এগিয়ে যাব। আচ্ছা, আজ রাতে কি আপনারা বাসায় আছেন, না বাইরে কোথাও যাবেন?'

'না, বাসাতেই থাকব আমরা।'

'ফর্মে আপনাদের ঠিকানা আছে, আমি কি আপনাদের বাসায় একটু আসতে পারি?'

'অবশ্যই।' আমার বলার আগেই ভীষণ উৎসাহী হয়ে বলে নিপা।

'আপনাদের জানতে ইচ্ছে করছে না, আমি কেন আপনাদের বাসায় আসব, তাও আবার রাত করে?'

'জি, ইচ্ছে করছে।' এবারও নিপা বলে।

'সেটা রাতেই বলব। তবে এটা জেনে রাখুন, এই যে কিছুক্ষণ ধরে আপনাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বললাম আমি, সেটা কিন্তু এমনি এমনি বলি নি। এসবের মাঝেই আপনাদেরকে জানার চেষ্টা করা হয়েছে।'

'আপনি চেয়ারে বসে যে ঘুমাচ্ছিলেন, সম্ভবত সেটাও আপনার ঘুম ছিল না।' মুখটা হাসি হাসি করে আমি বলি।

হায়াৎ রাস্তি সাহেব কিছুটা মুগ্ধ হয়ে আমার দিকে তাকান। আমি আর কিছু বলি না। পকেট থেকে একটা একশ' টাকার নোট বের করে কাচ ঘেরা বাক্সটার ভেতরে রেখে বের হয়ে আমি আমি আর নিপা। তার আগেই হায়াৎ রাস্তি সাহেব বলেন, 'থ্যাংকস।'

বাইরে থেকে বাসায় ফিরেই একটা কাজ অবশ্যই করবে নিপা। সেটা হলো, প্রথমেই বাসার সবগুলো রুম এক পলক দেখে নেওয়া। এটা ওর অনেকদিনের অভ্যাস। ওর বদ্ধমূল ধারণা, বাসায় ফিরেই ও একদিন দেখবে— আমাদের কোনো ঘরেই কোনো কিছু নেই, সব ঘরের সবকিছু চুরি হয়ে গেছে, কিংবা কোনো একটা ঘরে অপরিচিত কেউ বসে আছে, অথবা কেউ একজন ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আছে গলায় ফাঁস লাগিয়ে।

হায়াৎ রাস্তি সাহেবের কাছ থেকে ফিরে আজকেও সবগুলো ঘর দেখতে লাগল নিপা। একটু পর দৌড়ে এসে আতঙ্কিত গলায় বলল, 'তানজিকে তো কোথাও দেখছি না, রাহাত!'

'কী!' সোফা থেকে ঝট করে উঠে দাঁড়াই আমি। জুতা খুলছিলাম, একটা মাত্র খোলা হয়েছে, আরেকটা পায়েই আছে। ওই অবস্থাতেই সবগুলো ঘর ঘুরে আসি এক পাক, বারান্দাও। না, তানজি নেই, কোথাও নেই। অথচ বাইরের দরজায় তালা লাগানো ছিল, যেটা অক্ষতই ছিল, এইমাত্র সেটা খুলে আমরা ঘরে ঢুকেছি। তাহলে ও কি আমাদের আগের কাজের মেয়ে সুমীর মতো করল? মিথ্যা কথা বলে টেলিফোনে পাশের বাসার কাউকে ডেকে এনে, দরজার নিচ দিয়ে চাবি দিয়ে, দরজাটা খুলিয়ে নিয়ে, পালিয়ে গেল? মাথাটা একাএকাই এদিক-ওদিক করলাম আমি— না, সেটা সম্ভব না। কারণ সুমী ছিল ধূর্ত, চালাক; আর তানজি হচ্ছে বোকা, সরল। কৌশল করে পালানো তো দূরের কথা, এমনি এমনি পালানোর কথাই তো ওর মাথায় আসার কথা না। তাছাড়া ও চাবি পাবে কোথায়, নিপা আর আমার দুটো চাবিই তো আমাদের কাছে। সুমীই তো আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছে, বাইরে কোথাও গেলে সব চাবি সঙ্গে করেই নিয়ে যেতে হয়। সুমী চতুর ছিল, তানজি নির্বোধ।

তানজি সত্যি সত্যি নির্বোধ। ওকে যখন বাসায় প্রথম আনা হয়, সেদিন একটা সিদ্ধ ডিম খেতে দিয়েছিল নিপা ওকে। অপুষ্টিজনিত ও শুধু একটা শারীরিক কাঠামোই নিয়ে এসেছিল, শরীরের সঙ্গে তেমন আর কিছু ছিল না। একটু মোটাতাজাকরণের উদ্দেশ্যে তাই চেষ্টাটা ছিল প্রথম থেকেই। ডিমটা ওর হাতে

দিয়ে নিপা সংসারের এটা-ওটা সেরে, আমার সঙ্গে গল্প করে, এক ঘণ্টা পর কিচেনে গিয়ে দেখে ডিমটা হাতে নিয়ে তখনো দাঁড়িয়ে আছে তানজি। নিপা শব্দ করে অবাক গলায় কী যেন একটা বলে ওকে। আমি দৌড়ে কিচেনে যেতেই নিপা চোখ বড় বড় করে বলে, 'দেখেছ!'

কিছু বুঝতে না পেরে আমি বলি, 'কী?'

'তুমি দেখতে পাচ্ছো না কিছু?'

'অনেক কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি।'

'অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছো, না?' তানজির একটা হাত খপ করে ধরে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'এটা দেখেছ?'

'হ্যাঁ, দেখলাম তো।'

'এটা কি?'

'এটা আবার কী— ডিম।'

'তোমার এই মেয়ের হাতে এক ঘণ্টা আগে এই ডিমটা দিয়ে আমি সংসারের সব কাজ সারলাম, তোমার সঙ্গে গল্প করলাম, একটু টিভিও দেখলাম, তারপর এসে দেখি ডিমটা হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়েই আছে!'

'তুমি ওকে ডিমটা কী করতে বলেছিলে?'

'কী করতে আর বলব, খেতে বলেছিলাম'।'

'ও খায় নি কেন?'

'তার আমি কী জানি। তুমি ওকে জিজ্ঞেস করো।'

তানজির দিকে তাকালাম আমি। মাথা নিচু করে ডান হাতের মুঠোতে চেপে ধরে আছে ডিমটা, খোসা ছাড়ানো সিদ্ধ ডিম। আমি ওর মাথায় একটা হাত রেখে বললাম, 'কিরে, ডিমটা খাস নি কেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ও। আমি আবার জিজ্ঞেস করতেই ও মিনমিনে গলায় কী যেন বলে, বুঝতে পারি না আমি সেটা, নিপাও না। হাতের স্পর্শে স্নেহ, আদর, নির্ভয়তার মাত্রাটা বাড়িয়ে দিয়ে আমি ওকে আবার বলি, 'ডিমটা খাস নি কেন তুই?'

মাথাটা তুলে ও এক পলক আমার দিকে তাকায়, আড়চোখে একটু নিপার দিকেও তাকায়। তারপর মাথাটা আবার নিচু করে ফেলে শরম পাওয়া গলায় বলে, 'কতটুক খাব?'

হেসে ফেললাম আমি। দুটো কারণে— এক. আমার শাশুড়ি তানজিকে আমাদের এখানে পাঠানোর আগে প্রায় সাড়ে তিন মাস তিনি তার কাছে

রেখেছিলেন ওকে। শুদ্ধভাবে কথা বলা থেকে শুরু করে অনেক কিছু শেখানোর চেষ্টা করেছেন ওকে। দেখা যাচ্ছে, ভাষাটা ভালোই শিখিয়েছেন তিনি তানজিকে। ভালো লাগা বোধে তাই প্রথম হাসা। দুই. কতটুক খাবে, এটা কী বলছে ও!

হাসতে হাসতেই আমি বললাম, 'কতুটুকু খাবি মানে!' নিপাকে দেখিয়ে বললাম, 'ডিমটা তোর আপু দিয়েছে না তোকে?'

'হ্যাঁ।' ভাষা সংশোধন করে তানজি সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'জি।'

'দেওয়ার সময় কী বলেছে?'

'খেতে বলেছে।'

'কতটুকু খেতে বলেছে?'

'তা বলে নাই।'

'তোকে তো পুরোটাই খেতে দিয়েছে।'

'আমরা একটা ডিম চারজনে ভাগ কইর‍্যা খাইতাম, আমি তো কখনো আস্ত ডিম খাই নাই।'

সন্দ্বীপ এলাকার চরে বাস করা এতিম এ মেয়েটার কথা শুনে চোখে পানি এসে যায় আমার। সাতটা বছর কেটে গেছে, আর সেই মেয়েটা কিনা একটা পুরো ডিম কোনো দিন খায় নি। মহান স্রষ্টা এ মেয়েটার রিজেকে একটা আস্ত ডিম রাখে নি!

না খেয়ে থাকার কষ্টবোধ হারাতে হারাতে অনেক বোধই হারিয়ে ফেলেছে তানজি। একটা আস্ত ডিম হাতে নিয়ে ও তাই বোধশূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় এক ঘণ্টা— পুরো ডিমটাই ওর, না ডিমটার একটা অংশ?

বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর নিপা আমাকে একদিন বলল, 'বাজে একটা অভ্যাস হয়েছে মেয়েটার?'

'কী?'

'রান্নাঘরে কাজ করতে গেলেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।'

'তুমি ওকে বলেছ কেন বাইরে তাকিয়ে থাকে ও?'

'না।' নিপা রাগী স্বরে বলে।

'ঠিক আছে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। আমি একদিন জিজ্ঞেস করে দেখব।'

কিচেন থেকে কী একটা আনতে গিয়ে সুযোগ পেয়ে গেলাম একদিন। সিঙ্গেল কী একটা ধুতে গিয়ে সেটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তানজি আর গভীর আগ্রহ নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কী যেন দেখছে ও। আমি খুব আদুরে

গলায় বললাম, 'কী দেখছিস ?'

'পোলাপানের খেলা দেখি।'

'তোর খেলতে ইচ্ছে করে ?'

মাথা এদিক ওদিক ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কিছুটা বিষাদমাখা গলায় বলে, 'না, দেখতেই ভালো লাগে।'

দেখতেই তো ভালো লাগার কথা ওর। ভিক্ষা করার উদ্দ্যেশে অন্ধ নানিকে একটা কাঠের চাকার কাঠের গাড়িতে বসিয়ে ঠেলতে থাকত ও, আর শুধু চারপাশটা দেখত আর দেখত। গাড়ি ঠেলা আর দেখাই তো ওর কাজ ছিল, খেলবে কখন ও! ও তাই জানালা দিয়ে ওর বয়সি ছোট ছোট বাচ্চাদের খেলা দেখে, সুযোগ পেলেই দেখে। জিনিসপত্র ধোয়ার উদ্দেশ্যে পানির ট্যাপটা সেই যে খুলে রাখে, খুলে রেখে সেই যে বাইরে তাকিয়ে থাকে, বোধ থাকে না তখন ওর একেবারেই, একটুও না!

এ রকম নির্বোধ একটা মেয়ে ঘরে তালা লাগানো অবস্থায় কোথায় গেল! খুলে ফেলা জুতোটা আবার পরতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় নিপা পাশের ঘর থেকে হনহন করে এ ঘরে হেঁটে এসে বলল, 'এ ঘরে আসো, দেখে যাও।'

'তানজিকে পাওয়া গেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ?'

'সেটাই তো দেখাতে চাচ্ছি।'

দ্রুত পাশের ঘরে এসে নিপাকে বলি, 'কই ?'

'খাটের নিচে তাকাও।'

খাটের নিচে তাকালাম। ঘুমিয়ে আছে তানজি সেখানে, অদ্ভুতভাবে ঘুমিয়ে আছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, ঘুমের জন্য খাটের নিচের চেয়ে উত্তম কোনো জায়গা হয় না। কী নিশ্চিন্ত, কী নির্ভার ঘুম!

তানজির মাথাটা খাটের নিচের ভেতরের দিকে, পা দুটো বাইরের দিকে। আমি ওর একটা পা আলতো করে ছুঁয়ে বললাম, 'তানজি ?'

তানজি নড়ল না। নিপা কিছুটা রেগে গিয়ে বলল, 'ওভাবে ডাকছ কেন, একটু জোরে ডাকলে কী হয় ?'

'একটা মেয়ে ঘুমাচ্ছে, জোরে ডাকা যায় নাকি, চমকে উঠবে তো।'

'চমকে উঠুক, তুমি ওকে জোরে ডাকো, পা ধরে টান দাও। আর কোনো জায়গা পেল না, খাটের নিচে গিয়ে ঘুমাচ্ছে।' গজগজ করতে থাকে নিপা। হঠাৎ

নিপা আমার পাশে বসে তানজির পায়ে হাত রেখে মোলায়েম গলায় বলে, 'তানজি ?'

আলতো করে চোখ মেলে তানজি। তারপর খুব সাধারণ ভঙ্গিতে খাটের নিচ থেকে বের হয়ে এসে নিপার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু আগে অল্প রেগে যাওয়া নিপা কেমন হঠাৎ বদলে গিয়ে মায়াময় হয়ে যায়। তানজির মাথায় একটা হাত রেখে আরো মায়াময় গলায় বলে, 'ওখানে ঘুমাচ্ছিলি কেন তুই ?'

'খাটের নিচে ঝাড়ু— দিচ্ছিলাম তো, ঝাড়ু— দিতে দিতে ঘুমিয়ে পরেছি।'

হেসে ফেলি আমি, হেসে ফেলে নিপাও। হাসতে হাসতে নিপা জড়িয়ে ধরে তানজিকে। আমি অবাক হয়ে যাই। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি নিপার দিকে। কোনো কোনো দিন তানজি ঠিকমতো ফ্রিজ লাগাত না, বারান্দায় কাপড় মেলে দিয়ে ক্লিপ লাগাত না, টবের গাছগুলোতে ঠিকমতো পানি দিত না, আর এ প্রতিটা 'না'-এর জন্য একটা থাপ্পড় বরাদ্দ ছিল তানজির, নিপার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা থাপ্পড়। আর এখন কিনা নিপা কিছুই বলে না! কেমন আন্তরিকভাবে জড়িয়ে ধরেছে তানজিকে!

কলিংবেলটা বেজে ওঠে। নিপা আর আমি একসঙ্গে এগিয়ে যাই, কিন্তু দরজাটা খুলে দেয় নিপা। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যায় আমার। সুমা দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। আমার দিকে নয়, ও তাকিয়ে আছে নিপার দিকে। মুখটা হাসি হাসি, হাতে একটা গিফটের প্যাকেট।

'আমাকে চিনবে না তুমি।' স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথাটা বলে সুমা এক পা এগিয়ে আসে, নিপা একটু সরে দাঁড়ায়। তারপর সুমার বাড়ানো গিফটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বলে, 'আমি তোমাকে চিনি।'

'চেনো!' সুমা ওর চোখ দুটো একটু সরু করে বলে, 'কে আমি ?'

'সুমা।'

'বাব্বাহ, চিনলে কী করে! তুমি তো আমাকে দেখোই নি কখনো ?'

'অন্তত সাতবার যার নাম প্রতিদিন উচ্চারিত হয় এখানে, যার প্রসঙ্গ আসে মাঝে মাঝেই, যার অদৃশ্য উপস্থিতি এখানে সবসময়, তাকে চিনব না ?'

'বেশ ভালো কথা বলো তো তুমি!'

'কেন, তুমি কি আমাকে বোকা ভেবেছিলে ?'

'মোটেও না।'

'আসো তো।' নিপা সুমার একটা হাত টেনে ধরে এগুতে এগুতে বলে, 'আমাদের বাসায় তোমার আরো অনেক আগেই আসা উচিত ছিল।'

'ইচ্ছে ছিল।'

'তো।'

'সাহস হয় নি।'

'কেন ?' নিপা খিলখিল করে হেসে ওঠে।

'ঠিক সাহস না।'

'সংকোচ ?'

'হ্যাঁ।'

'শোনো।' নিপা সুমাকে একটা সোফায় বসিয়ে দিয়ে বলে, 'কোনো সংকোচ টংকোচ থাকা চলবে না। তুমি আর রাহাত এক সময় বন্ধু ছিলে।' নিপা আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্টু দুষ্টু হেসে বলে, 'খুব ভালো বন্ধু ছিলে, এতে সংকোচের কি আছে ? ওসব পুরনো চিন্তা-ভাবনা ঝেড়ে ফেল। আরেকটা কথা, তুমি আজ সারাদিন এখানে থাকবে, আমার সঙ্গে সারাক্ষণ গল্প করবে।'

কলিং বেলটা আবার বেজে ওঠে। এবার আমি উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দেই। মোর্শেদ ভাই দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। আমাকে দেখে মুখটা ম্লান করে বললেন, 'একটা সমস্যায় পড়েছি ভাই।'

'কী সমস্যা, মোর্শেদ ভাই ?'

'ভেতরে এসে বলি ?'

দরজা থেকে সরে দাঁড়াই আমি। তিনি ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন, 'কোনো সমস্যা করলাম না তো ?'

'না না, ঠিক আছে।'

নিপাকে দেখে তিনি আরো করুণ গলায় বললেন, 'ভাবি, একটু সময় নষ্ট করব আপনাদের, কিছু মনে করবেন না প্লিজ।'

'না না, ঠিক আছে, প্লিজ বসুন।' নিপা কোনার সোফাটায় গিয়ে বসে। সুমাও ওদিকে সরে যায়।

সোফায় বসে মোর্শেদ ভাই বলেন, 'আগে এক গ্লাস পানি খাওয়ান।'

'এক কাপ চা দেই ?'

'চায়ের দরকার নেই, আপনি আমাকে এক গ্লাস শীতল পানি দেন। গলাটা শুকিয়ে গেছে।'

নিপা দ্রুত পানি এনে দিতেই এক ঢোকে পানিটা খেয়ে ফেললেন মোর্শেদ ভাই। তারপর হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে বললেন, 'আমার তো এখন রাতে ঘুম হয় না ভাই!'

'কেন ?'

'বাথরুমের ভেতর দাঁড়িয়ে সারারাত আপনার বারান্দার দিকে তাকিয়ে থাকি। সেই বাচ্চাটাকে দেখার চেষ্টা করি।'

'দেখেছেন আপনি আবার ওকে ?'

'কাল রাতে এক পলক বোধহয় দেখেছিলাম। তারপর ভালো করে তাকিয়ে দেখি, নেই। একেবারে হাওয়া।'

'সত্যি সত্যি দেখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ। দেখলাম, আপনাদের বারান্দায় দুটো চেয়ার আছে না, নীল না কালো রঙের।'

'সাদা রঙের।'

'বাচ্চাটা সেই সাদা রঙের চেয়ার দুটোর ওপর দু'পা রেখে লাফাচ্ছে।'

'বাচ্চা ছেলে দু'চেয়ারের ওপর দু'পা রেখে লাফাবে কীভাবে ? পড়ে যাবে না।'

'না, পড়ে যেতে তো দেখলাম না। যদিও আমি এক পলক দেখেছি। তারপর তো আর দেখলাম না বাচ্চাটাকে।'

'ব্যাপারটাতো তাহলে সমস্যারই।'

'সমস্যা আরো আছে ভাই। সারারাত ওভাবে কাটানোর পর যখন সকালে ঘুমাতে যাই বিছানায় ঘুম তো তখন আসেই না, একটুবা যা আসে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভেঙে যায়।'

'কেন ?'

'স্বপ্ন দেখে।'

'কী স্বপ্ন দেখেন আপনি ?'

'অদ্ভুত সব স্বপ্ন, ভাই। একেক সময় একেক রকমের স্বপ্ন। এক সময় দেখি, বাচ্চাটা আমার কাছে এসে থুতনি হাতিয়ে বলছে, তোমার দাড়ি কই, তোমার দাড়ি কই ? আরেক সময় দেখি, সে আমার দাঁত খুঁচিয়ে বলছে, তোমার দাঁতে ময়লা, তোমার দাঁতে ময়লা। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, ও প্রায়ই আমার পাতায় সুড়সুড়ি দেয়। আমার তখন ঝট করে ঘুম ভেঙে যায়।'

'ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আপনার কী মনে হয় ?'

'আমার কিছু মনে হওয়ার আগে আমি ওই বাচ্চাটাকে খুঁজতে থাকি। কিন্তু আশপাশে কোথাও পাই না। এত সুন্দর একটা বাচ্চা! আমার সব আছে ভাই, বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, ব্যাংক ভর্তি টাকা আছে, কিন্তু একটা সন্তান নেই। মহান

আল্লাহ্ পাক আমাকে এত কিছু দিল আর একটা সন্তান দিল না।' শব্দ করে কেঁদে ওঠেন মোর্শেদ ভাই। বাচ্চা ছেলের মতো তিনি কাঁদছেন, 'আমার এসব কে খাবে ভাই, কে দেখবে, কে ভোগ করবে!' ঝট করে তিনি কান্না থামিয়ে বলেন, 'আপনি আবার ভাববেন না, সারাক্ষণ একটা সন্তানের কথা ভাবি বলে আমি আপনাদের বারান্দায় একটা বাচ্চার ছায়া কিংবা বাচ্চার প্রতিচ্ছবি দেখেছি। আমি আসলেই একটা বাচ্চাকে দেখেছি, ভাই।'

সুমা একটু এগিয়ে এসে বলে, 'আপনি সিওর?'

মোর্শেদ ভাই এই প্রথম সুমার দিকে তাকালেন। তারপর আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই বললাম, 'আমাদের বন্ধু।'

'স্লামালাইকুম।' মোর্শেদ সাহেব সুমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'আমি সিওর। আমার কথা শুনে আপনার আমাকে পাগল ভাবতে পারেন। আমি আসলে তা না। আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে, প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা, আমি আর আমার এক ছোট ভাই পেসাব করার জন্য বাহির বাড়ির একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। রাত তখন দুইটা কি আড়াইটা। আমরা ভয় পাই বলে মা আমাদের সঙ্গে ছিল। একটু ফাঁকে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া বড় রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে ইয়া লম্বা একটা লোক হাঁটছেন। লুঙ্গিপরা, মাথায় পাগড়ি, কিন্তু গায়ে কাপড় নেই। প্রায় দশ ফুট লম্বা মানুষটাকে দেখে মাকে বললাম, মা, ওইটা কে? মা লোকটার দিকে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে ছোট ভাইটাও তাকাল। কোনো কিছু না বলে মা আমাদের হাত ধরে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতর নিয়ে এলো। এ নিয়ে তার পরের দিন কত কথা। একজন না হয় ভুল দেখে, কিন্তু তিন তিনজন লোক তো একই সঙ্গে ভুল দেখতে পারে না। এর ব্যাখ্যা আপনারা কীভাবে দেবেন?'

'অলৌকিক কিছু ঘটনা এ পৃথিবীতে মাঝে মাঝে ঘটে।' সুমা বলে।

'সেটা না হয় মানলাম। কিন্তু আমি যে রাহাত সাহেবের বারান্দায় একটা বাচ্চাকে দেখেছি, সেটা কোনো অলৌকিক ঘটনা না। আমি সত্যি দেখেছি, এই নিজ চোখে দেখেছি।' মোর্শেদ সাহেব আবার কাঁদতে থাকেন, 'আল্লাহ্ পাক আমাকে একটা সন্তান দিল না...।' চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন।

মনটা অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল আমার। নিপা উঠে ভেতরের ঘরে গেল, সুমা চুপচাপ বসে রইল মাথা নিচু করে।

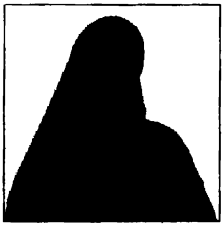

নিপা আর আমার দিকে তাকিয়ে হায়াৎ রাস্তি সাহেব মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বললেন, 'কী, অবাক হয়েছেন, না?'

প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস নিয়ে নিপা বলল, 'এটা কি অসম্ভব রকম অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার না! আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।'

ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে হায়াৎ রাস্তি সাহেব বললেন, 'না, মোটেই অসম্ভব রকম অবাক হওয়ার ব্যাপার না। এ পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তার সব কিছুই পূর্ব নির্ধারিত, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাছাড়া আমি তো বলেছিলাম, রাতে আপনাদের বাসায় আসতে পারি আমি।'

'কিন্তু আপনি যে সিরিয়াসলি বলেছেন সেটা কিন্তু বিশ্বাস করি নি আমরা। প্লিজ, বসুন না।' বাচ্চা মেয়ের ঈদের জামা পাওয়ার মতো আনন্দিত মনে হচ্ছে নিপাকে।

খুব আয়েশ করে সোফায় ঠেস দিয়ে বসলেন হায়াৎ রাস্তি সাহেব। তার পাশের সোফায় বসে আমি বললাম, 'বাসা চিনতে কোনো অসুবিধা হয় নি তো?'

'হয়েছে।'

'বাসা চিনতে অসুবিধা হয়েছে!'

'হ্যাঁ। কারণ আপনাদের বাসার ঠিকানাটা ফেলে রেখে এসেছি আমি, মুখস্থও ছিল না সেটা। কেবল বাসার নাম্বারটা মনে ছিল। সেটা ধরেই প্রায় এক ঘণ্টা খুঁজে বাসাটাকে পেলাম। আচ্ছা, আপনাদের মোবাইল নম্বরটা ০১৭১১৯৪৪৭০৫ না?'

'জি।'

'দেখেন, ফোন নম্বরটা একবার কি দুবার দেখেছি, ঠিকই মনে আছে সেটা।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব ড্রইংরুমের চারপাশটা তাকিয়ে বললেন, 'এ বাসায় আপনারা কতদিন আছেন?'

'তা প্রায় দু'বছর।'

'এর আগে এ ফ্ল্যাটে কে বা কারা থাকতেন, জানতেন?'

'না।'

'বাড়িওয়ালা কোথায় থাকেন?'

'তিনি এখানে থাকেন না। ওনার আরেকটা বাড়ি আছে, তিনি ফ্যামিলি নিয়ে সেখানে থাকেন।'

'আপনাদের আশপাশের ফ্ল্যাটে যারা থাকেন, তাদের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কেমন?' হায়াৎ রাস্তি সাহেব আবার ড্রইংরুমটা ভালো করে দেখলেন।

'খুবই ভালো সম্পর্ক।'

সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন হায়াৎ রাস্তি সাহেব। তার আগেই একটা ট্রে হাতে নিয়ে নিপা এসে উপস্থিত। খুব আগ্রহ নিয়ে তিনি নিপার হাতের ট্রের দিকে তাকালেন। তার পর চোখ দুটো সরু করে বললেন, 'লেবুর শরবত?'

'জি।' নিপা হাসতে হাসতে বলে।

'আমি যে লেবুর শরবত পছন্দ করি সেটা জানলেন কী করে?'

'আপনার কিচেনে চা বানাতে গিয়ে জেনেছি।'

ট্রে থেকে শরবতের গ্লাসটা হাতে নিয়ে হায়াৎ রাস্তি বললেন, 'কীভাবে?'

'আপনার সিঙ্কের নিচের ময়লা ফেলার ঝুড়িতে অনেকগুলো লেবুর টুকরা দেখেছি আমি। অথচ আপনি লেবু চা খান না। এতগুলো লেবুর খোসা নিশ্চয় এমনি এমনি আসে নাই। তাই ভাবলাম আপনি লেবুর শরবত খেতে পছন্দ করেন। তাও আবার যেই সেই লেবু দিয়ে না, বাজারে সুগন্ধি একটা লেবু পাওয়া যায়, গোল গোল, এলাচি লেবু। আপনি সেই লেবুর শরবত খান।'

'আপনারাও কি এই লেবু পছন্দ করেন?'

'করি, তবে বাসায় সাধারণত এ লেবু আনা হয় না।'

'আজ পেলেন কোথায়?'

নিপা আবার হাসতে হাসতে থাকে, 'মনে মনে একটা আশা ছিল, আপনি হয়তো আমাদের বাসায় আসতেও পারেন। তাই আপনার ওখান থেকে বাসায় ফেরার সময় কিনে এনেছি।'

শরবতের গ্লাসটা হাতে নিয়ে হায়াৎ রাস্তি সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন নিপার দিকে। আমি খেয়াল করলাম, তার চশমার পেছনের চোখ দুটো ভিজে যাচ্ছে। তিনি একটু এগিয়ে গিয়ে নিপার মাথায় একটা হাত রেখে বললেন, 'আমি সবসময় বুদ্ধির চর্চা করি। তাই কোনো বুদ্ধিমান মানুষ পেলে আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। মানুষের বিশালত্ব, বুদ্ধি, মনুষ্যত্ব আর মানবতা আমাকে মুগ্ধ করে। চোখ ভিজে আসে আমার।'

'ভালোবাসা ?' নিপা খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'না, ভালোবাসা পরিবর্তনশীল। মানুষ আজ যাকে ভালোবাসে, কাল তাকে ভুলে যায়।' খালি গ্লাসটা নিপার দিকে এগিয়ে দিতেই নিপা খুব আন্তরিকভাবে বলে, 'আরেক গ্লাস দেই।'

হায়াৎ রাস্তি সাহেব স্নেহভরা দৃষ্টিতে নিপার দিকে তাকান। মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন তিনি। নিপা খালি গ্লাস আর ট্রেটা নিয়ে দ্রুত চলে যায় কিচেনে।

'আচ্ছা—।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব এগিয়ে গিয়ে ডান পাশের দেয়ালে দিকে টাঙানো একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, 'এটা কার আঁকা জানেন ?'

'জানি না। আমার এক বন্ধু গিফট করেছিল আমাদের।'

'আপনার ড্রইংরুমে তো বেশ কয়েকটা অ্যানটিক টাইপের পুতুল দেখছি। এগুলো কি আপনি নিজেই যোগাড় করেছেন ?'

'না, এগুলো নিপার কালেকশন।'

'খুব সুন্দর কিছু কালেকশন আছে আপনাদের।' ব্রোঞ্জের একটা ছোট্ট পুতুল হাতে নিয়ে হায়াৎ রাস্তি সাহেব বলেন, 'এটা কোথায় পেয়েছে, জানেন ?'

'কয়েকদিন আগে নিপা কোথা থেকে যেন কিনে এনেছে।'

'কতদিন ধরে আপনার স্ত্রী এসব কালেকশন করছে ?

'বেশি দিন না।'

'আপনি কি একটা জিনিস খেয়াল করেছেন, এখানকার সবগুলো পুতুলই এক ধরনের এবং সবগুলো পুতুলই বাচ্চা মেয়ের পুতুল ?'

'না, সেটা তো খেয়াল করি নি।'

'মানুষের নিজস্ব কিছু পছন্দ থাকে, সেটা তার একা-ই নিজস্ব। আপনার স্ত্রী হয়তো এরকম বাচ্চা মেয়ের পুতুলই পছন্দ করে।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব আবার সোফায় গিয়ে বসলেন।

নিপা আরেক গ্লাস শরবত বানিয়ে এনেছে। তবে এবারের গ্লাসটা বড়। তাই দেখে হায়াৎ রাস্তি সাহেব হেসে ফেলে বললেন, 'এত বড় গ্লাস!'

'এটা আমার বাবার গ্লাস ছিল, বাবা এটাতে পানি খেতেন।' নিপা বেশ উৎসাহী হয়ে বলে।

'বাবাকে আপনি খুব ভালোবাসতেন, না ?'

'বাবা তার চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন আমাকে।'

শরবতের গ্লাসটা মুখে নিতে নিতে হায়াৎ রাস্তি সাহেব বললেন, 'আপনাদের একটা কাজের মেয়ে আছে না, তানজি ? ও কোথায় ?'

'আছে। ডাকব?'

'ডাকুন।'

তানজি ঘরে ঢুকেই বলল, 'আসসালামু ওলাইকুম।'

হায়াৎ রাস্তি সাহেব তানজির দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি আমার পাশে বসো।' তানজিকে তিনি পাশে বসিয়ে বললেন, 'এই যে তুমি যাদের কাছে থাকো, তোমার আপু আর ভাইয়া—।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব আমাকে আর নিপাকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনাদের তো তুমি আপু আর ভাইয়া বলেই তো ডাকো, নাকি?'

তানজি মাথা উপর-নিচ করে বলে, 'জি।'

'এ দুজনের মধ্যে ভালো কে— ভাইয়া, না আপু?'

'দুজনই।'

'দুজনই?'

'জি।'

'গুড।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব তানজির মাথায় হাত রেখে বলেন, 'তোমার গালে একটা লম্বা কাটা দাগ দেখা যাচ্ছে, এটা কীভাবে হয়েছে?'

'জানি না।'

'উঁহু, মিথ্যা বলা যাবে না। ঠিক আছে, বলতে ইচ্ছে না করলে বলার দরকার নেই। কিন্তু আমি জানি তুমি জানো। কারণ এ দাগটা খুব বেশি দিন আগের দাগ না, দেড় কি দুই বছর আগের দাগ। আচ্ছা।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব নিপার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তানজি কত দিন ধরে আপনাদের এখানে, মানে এ বাসায় আছে?'

'বছর তিনেক তো হলোই।'

'ওকে তো আপনার আম্মা এনে দিয়েছেন, না?'

'জি।'

হায়াৎ রাস্তি সাহেব আবার তানজির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোমার কী খেতে পছন্দ করে?'

'সব খাইতেই ভালো লাগে।'

'কলা?'

'ভালো লাগে।'

'দুধ?'

'ওটাও ভালো লাগে।'

'তুমি কি মাঝে মাঝে তোমার ভাইয়া-আপুকে না জানিয়ে কিছু খাও ?' মাথা নিচু করে ফেলে, কিছু বলে না।

হায়াৎ রাস্তি সাহেব হাসতে হাসতে বলেন, 'আগে খেতে, এখন খাও না, না ?'

তানজি এবারও কিছু বলে না। হায়াৎ রাস্তি সাহেব মাথায় হাত বুলাতে থাকেন ওর। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন, 'তোমার পছন্দের খেলনা কোনটি ?'

'পুতুল।'

'ঠিক আছে, তুমি এখন যাও।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব নিপার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'রাতের মেন্যু কী ?'

'ইলিশ মাছ।'

'ইলিশ মাছ আমার তেমন পছন্দ না।'

'কই মাছ ?'

'মোটামুটি।'

'পাবদা মাছ ?'

'ওটাও মোটামুটি।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব একটু থেমে বলেন, 'আপনি আজ সবই রান্না করেছেন নাকি ?'

'জি।'

'এত মাছ কেন ?'

'আপনি আসবেন, কিন্তু আপনার পছন্দের খাবার তো জানি না।'

'আপনারা না ভেবেছিলেন আমি আসব না ?'

'একটু একটু আশা করেছিলাম।'

হায়াৎ রাস্তি সাহেব কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলেন, 'ওই একটু একটু আশাই হচ্ছে মানুষের বেঁচে থাকার প্রেরণা, মানুষের বড় হওয়ার পথ।'

'ভর্তা পছন্দ করেন আপনি, পোড়া বেগুন ভর্তা ?'

'ইয়েস।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে বলেন, 'আমার খুব ইচ্ছে, আমাদের দেশে যতরকম ভর্তা আছে, কেউ একজন আমাকে করে খাওয়াক, প্রাণ ভরে আমি একদিন এসব ভর্তা দিয়ে ভাত খেতে চাই।'

নিপা লাফ দিয়ে ওঠার মতো করে উঠে বলে, 'আপনি একটু বসুন, আমি যতগুলো পারি আপনার জন্য ভর্তা তৈরি করছি।'

হায়াৎ রাস্তি সাহেব হাত দিয়ে ইশারা করে নিপাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'আজ থাক। জরুরি কিছু কাজ আছে আমার। তার আগে একটা ধাঁধার সমাধান

করতে হবে। কয়েকদিন মাথার ভেতর ধাঁধাটা কুট কুট করছে। আপনারা দুজনই আমার সামনে বসুন। আমি ধাঁধাটি বলি। আপনারা শুনুন।'

'রাত তো অনেক হয়েছে, আগে খেয়ে নেই।'

'না, আগে ধাঁধাটা শুনুন। তিনটা ছেলে একটা হোটেলে খেতে গেছে। খাওয়ার পর তাদের বিল হয়েছে মোট পঁচাত্তর টাকা। তারা প্রত্যেকে পঁচিশ টাকা করে দিয়ে মোট পঁচাত্তর টাকা হোটেল বয়কে দিল বিলটা শোধ করতে।'

'তিন বন্ধু সমান সমান পঁচিশ টাকা করে দিয়েছে?' নিপা খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

হায়াৎ রাস্তি সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'সাধারণত কয়েক বন্ধু মিলে কোনো হোটেলে খেতে গেলে একজন কিংবা দুজন মিলে বিল দেয়, সবাই সমান ভাগে বিল দেয় না। যেহেতু এটা একটা ধাঁধা তাই সবাই সমান ভাগে টাকা দিয়েছে, অর্থাৎ সবাই পঁচিশ টাকা করে দিয়েছে।'

নিপা একটু ঝুঁকে বসে বলে, 'তারপর?'

'হোটেল বয়টি হোটেল মালিককে টাকাটা দিতেই হোটেল মালিক পাঁচ টাকা কম নিয়ে ওই তিন ছেলেকে তা ফেরত দিতে বলল। হোটেল বয় টাকাটা ছেলে তিনজনকে ফেরত দিতেই তারা বয়কে দু'টাকা টিপস দিল, আর বাকি তিন টাকা এক টাকা করে তিন জন নিয়ে নিল। এবার বলুন, একেকজন কয় টাকা খরচ করল?' হায়াৎ রাস্তি সাহেব আমাদের দিকে তাকালেন।

নিপা হিসেব কষতে লাগল, 'পঁচিশ টাকা করে দিয়েছিল, দুই টাকা বয়কে দেওয়ার পর এক টাকা করে ফেরত পেল। তাহলে প্রত্যেকে খরচ করল চব্বিশ টাকা।'

'চব্বিশ টাকা।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব, 'তাহলে ওরা প্রত্যেকে খরচ করেছে চব্বিশ টাকা। তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'একেকজনের চব্বিশ টাকা খরচ হলে তিনজনের মোট কত টাকা খরচ হলো?' হায়াৎ রাস্তি সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

নিপা আবার হিসেব কষতে থাকে, 'তিন চব্বিশে ষাট যোগ বারো, হ্যাঁ হ্যাঁ বাহাত্তর টাকা।'

'গুড। বাহাত্তর টাকা। আর বয়কে দিয়েছে দু টাকা। এবার মোট কত টাকা হলো?'

'বাহাত্তর যোগ দুই— চুয়াত্তর...। চুয়াত্তর টাকা।'

'কিন্তু ছেলে তিনজন তো দিয়েছিল পঁচাত্তর টাকা, বাকি এক টাকা গেল কই ?' হায়াৎ রাস্তি সাহেব আবার আমাদের দিকে তাকান।

নিপা চোখ বড় বড় করে বলে, 'তাই তো— এক টাকা গেল কই ?'

হায়াৎ রাস্তি সাহেব দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'আমার ধাঁধা হচ্ছে এটাই— এক টাকা গেল কই ?'

নিপা আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুমি বলতে পারবে ?'

'আমার মাথায় ঠিক আসছে না।'

আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে উঠে দাঁড়ালেন হায়াৎ রাস্তি সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে নিপা বলল, 'কোথায় যাচ্ছেন ?'

'বাসায় যাব, রাত তো অনেক হয়েছে।'

'খাবেন না ?'

'রাতে আমি তেমন কিছু খাই না। তবে আজ ভেবেছিলাম আপনাদের এখানে খাব, কিন্তু ধাঁধার সমাধানটা মাথা থেকে বের না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না। দেখি, আরেকদিন আসব।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে নিতেই ঘুরে দাঁড়ালেন। নিপার দিকে তাকিয়ে কাছে ডাকলেন ইশারা করে। তারপর ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'মন খারাপ হলো ? মাঝে মাঝে মন খারাপ হওয়া ভালো। তাতে বোঝা যায় একটু আগে আমার মন ভালো ছিল, মন খারাপটা কেটে গেলে আবার ভালো থাকব। অধিকাংশ মানুষের বেশির ভাগ সময় মন ভালো থাকে, কিন্তু সেটা তারা বুঝতে পারে না।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব একটু থেমে বলেন, 'আজ আরেকটা জিনিস ভেবে এসেছিলাম।'

নিপা অস্ফুট স্বরে বলে, 'কী ?'

'আপনাদের এখানে থেকে বাচ্চাটার কথা শুনব। দেখতাম, ও আজ রাহাত সাহেবকে বলে কিনা— তুমি আমাকে মেরে ফেললে, বাবা!'

বাসা থেকে চলে যাওয়ার পনের মিনিট পর হায়াৎ রাস্তি সাহেব ফোন করলেন আমাকে, 'রাহাত সাহেব, একটা সমস্যা হয়ে গেছে।'

চমকে উঠে আমি বললাম, 'কী সমস্যা ?'

'আমি আপনাদের বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। বেয়াদবি নেবেন না, একটু আসতে পারবেন ?'

'অবশ্যই।'

দ্রুত বড় রাস্তার মোড়ে এসে দেখি, রাস্তার এক কোনায় লাইটপোস্টের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন হায়াৎ রাস্তি সাহেব। আমাকে দেখেই তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'দেখেন তো কী কাণ্ড হয়ে গেল!'

'কী হয়েছে?'

'একটা ক্যাবের জন্য দাড়িয়ে ছিলাম এখানে। হঠাৎ কোত্থেকে চারটা ছেলে এসে বলে, আঙ্কেল, জীবনে তো অনেক ভোগ করেছেন, এবার আমাদের একটু করতে দিন। যা আছে, দিয়ে দিন আমাদের।

আমি বললাম, কী চাও তোমরা?

ওরা বলল, যা আছে সব দিয়ে দিন।

আমি আমার মানিব্যাগটা ওদের হাতে দিয়ে দিলাম।

ওরা বলল, আর কিছু নাই?

আমি বললাম, না।

মোবাইল?

মোবাইল ইউজ করি না আমি।

মানিব্যাগ থেকে টাকাগুলো বের করে খালি মানিব্যাগটা আমাকে ফেরত দিয়ে বলে, আমাদের কিছু টাকা দরকার ছিল, টাকাগুলো নিয়ে গেলাম।

কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ একটা ছেলে ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর আমার কাছে এসে হাতে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বলে, আপনার তো একটু অসুবিধা করে ফেললাম, আঙ্কেল। এই টাকাটা দিয়ে পরিচিত কাউকে ফোন করুন, উনি এসে আপনাকে সাহায্য করবেন। আশপাশে পরিচিত কাউকে না পেয়ে আপনাকে ফোন করলাম।'

'খুবই ভালো করেছেন, কিন্তু—।'

'না না ভাববেন না, আমাকে একটা ক্যাব ঠিক করে দিন। আমি ঠিক বাসায় পৌঁছে যেতে পারব।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব একটু থেমে বলেন, 'একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগল— যত কিছুই হোক মানুষের মমত্ববোধ এখনো মরে যায় নি!'

বারান্দায় মেলানো টাওয়েলটা আনতে গিয়েই নিপা দৌড়ে এলো আমার কাছে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'দেখে যাও।'

'এত রাতে কী দেখব ?'

'আমি বললে তো মজা পাবে না। তুমি নিজে এসে দেখে যাও।'

'আগে বলোই না কী ?'

'আহ্, আসো তো।' নিপা আমার হাত ধরে টানতে থাকে। অগত্যা আমাকে উঠতে হয়। বারান্দায় এসেই নিপা ফিসফিস করে বলে, 'মোর্শেদ ভাইদের বাথরুমের জানালার দিকে তাকাও।'

তাকালাম আমি এবং যথারীতি চমকে উঠলাম। মোর্শেদ ভাইয়ের বউ রীতা ভাবি তাকিয়ে আছেন জানালা দিয়ে এবং তিনি তাকিয়ে আছেন আমাদের পাশের বারান্দার দিকে, মোর্শেদ ভাই যেভাবে তাকিয়ে থাকেন সেভাবে।

আমি বললাম, 'ভাবি একা, না মোর্শেদ ভাইও আছে সাথে ?'

'মোর্শেদ ভাই নেই।'

'তুমি বুঝলে কীভাবে মোর্শেদ ভাই নেই ?'

'ওই যে ওনাদের বেডরুমের জানালার দিকে তাকাও। বাতাসে জানালার পর্দা উঠছে আর নামছে। মোর্শেদ ভাইকে দেখা যাচ্ছে বিছানায়, সম্ভবত ঘুমিয়ে আছেন তিনি।'

'মোর্শেদ ভাই ঘুমিয়ে আছেন, কিন্তু রীতা ভাবি জানালার দিকে তাকিয়ে আছেন, ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল না ?'

'ব্যাপারটা আর কেমন হয়ে গেল, মোর্শেদ ভাইয়ের সঙ্গে থাকতে থাকতে ভাবিরও অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'দু'জনের মাথাই গেছে।'

নিপা হঠাৎ আমার হাত খামচে ধরে বলল, 'দেখো দেখো, মোর্শেদ ভাইকে দেখা যাচ্ছে এখন।'

ভালো করে বাথরুমের জানালার দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, রীতা ভাবির জায়গায় এখন মোর্শেদ ভাই। বেডরুমের জানালার দিকে তাকালাম, ভাবি শোওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

'ওনারা কি পালা করে তাকিয়ে থাকেন আমাদের বারান্দার দিকে!' নিপার দিকে তাকাই আমি।

'আমার তো তাই মনে হচ্ছে।' নিপা ফিক করে হেসে ফেলে, 'একটা কাজ করবে নাকি ?'

'কী ?'

'বড় একটা কাপড় দিয়ে গা-হাত-মুখ ভালো করে ঢেকে চলো আমাদের বারান্দায় আমরা কিছুক্ষণ লাফিয়ে আসি। কিছুক্ষণ লাফাবে তুমি, কিছুক্ষণ লাফাব আমি। তারপর দেখব, ওনারা কী করেন ?'

'কী আর করবেন, সকাল হওয়ার সঙ্গে বাসায় এসে উপস্থিত হবেন। চলো তো, এসব দেখতে হবে না এখন।' নিপার হাত ধরে ঘরের ভেতর চলে আসি আমি। লাইটটা অফ করে বিছানায় শুতেই নিপা হাসতে শুরু করল সঙ্গে সঙ্গে। খিলখিল করে হাসতে লাগল প্রথমে। একটু হেসেই চুপ। কিছুক্ষণ আর কোনো শব্দ নেই। হঠাৎ আবার হাসতে শুরু করে। হাসির শব্দটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে একসময় চিৎকারের মতো শোনায় হাসিটা। আমি নিপার গায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলি, 'এই নিপা, কী হয়েছে তোমার ?'

নিপা ঝনঝন করে হাসতে হাসতে বলে, 'আমার হাসি রোগ হয়েছে।'

'এটা কী বলছ তুমি ?'

'কেন, আমার যা হয়েছে আমি তাই বললাম।'

'এতরাতে এভাবে হাসলে মানুষ বলবে কী!'

'মানুষ কী বলবে সেটা জানার দরকার কী আমার! আমার হাসি পাচ্ছে আমি হাসছি। আমি কি কাউকে বলছি, এই যে, এই যে মা-বোন ও ভায়েরা, আমি হাসছি, আপনারা আমার হাসি শোনেন, খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন।' নিপা আগের চেয়ে শব্দ করে হাসতে থাকে, তার হাসিটা অন্যরকম মনে হয় আমার কাছে, যেন নিপা হাসছে না, অন্য কেউ হাসছে।

'নিপা, চুপ করো।'

'না, আমি চুপ করব না। আমি আমার বাসায় আমার ঘরে হাসছি, আমার যতক্ষণ হাসি আসবে আমি ততক্ষণ হাসব, প্রাণ খুলে হাসব, আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে হাসব।'

'এখন অনেক রাত নিপা। একটু শব্দ হলেই আশপাশের মানুষ সব শুনতে পায়। প্লিজ, তুমি চুপ করো।'

'তুমি যত চুপ করতে বলবে, আমি তত হাসব।'

'আমি কিন্তু বাসা থেকে বের হয়ে যাব নিপা।'

'যাবে, যাও। কোথায় যাবে ? সুমার বাসায় ? যাও। সুমার স্বামী তো দেশে নেই, তুমি যাও। ওর সঙ্গে ঘুমাও।' নিপা কথাগুলো বলছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কথাগুলো নিপার গলা দিয়ে বের হচ্ছে না।

'ছিঃ নিপা! এসব কী বলছ!'

'ঠিক আছে, সুমার বাসায় না যাও রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। হায়াৎকে রাস্তায় ধরেছিল ছিনতাইকারীরা, তোমাকে কে ধরবে ?' নিপা বিকৃত শব্দ করে হাসতে হাসতে বলে, 'তোমাকে ধরবে রাস্তার মেয়েরা।'

'নিপা, আমি কিন্তু সত্যি সত্যি বাইরে চলে যাব।'

'বললাম তো যাও।'

'দাঁড়াও, আগে লাইটটা জ্বালিয়ে নেই।'

নিপা খপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'খবরদার, লাইট জ্বালাবে না। আমার পাশে একজন শুয়ে আছে, ওর ঘুম ভেঙে যাবে। ও কান্না শুরু করে দেবে। লাইট জ্বালালে ও ঘুমাতে পারে না।'

আমি এবার একটু চিৎকার করে বলি, 'এসব কী বলছ তুমি নিপা ?'

নিপা হঠাৎ হাসি থামিয়ে কান্না শুরু করে দেয়, 'এভাবে কথা বলছ কেন তুমি আমার সঙ্গে!'

'স্যরি, আর বলব না।'

'প্রমিজ ?'

'প্রমিজ।'

'তাহলে তিনবার স্যরি বলো ?'

'স্যরি স্যরি স্যরি।'

'আবার বলো।'

'স্যরি।'

'একবার না, তিনবার।'

'স্যরি স্যরি স্যরি।'

বিছানায় উঠে বসে নিপা। আমাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বলে, 'লাইট জ্বালাও তুমি। তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব, জরুরি কথা।'

লাইটটা জ্বালালাম আমি। তারপর বিছানার দিকে তাকাতেই চমকে উঠলাম প্রচণ্ড। নিপার ব্লাউজের উপরের দুটো বোতাম খোলা, সেখান দিয়ে ওর একটা বুক দেখা যাচ্ছে। সদ্য মা হওয়া মেয়েরা যেমন করে বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়ায়, নিপাকে এখন ঠিক তেমন দেখাচ্ছে।

'নিপা, তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন, ব্লাউজের বোতাম লাগাও।'

বোতাম লাগাতে লাগাতে নিপা বলে, 'আচ্ছা, বলো তো— আমি সুন্দর, না সুমা সুন্দর ?'

'তুমি সুন্দর।'

'সুমা যদি এ প্রশ্নটা করত, তাহলে কী বলতে ?'

'তখনো বলতাম তুমি সুন্দর।'

'উঁহু, তুমি বলতে সুমা সুন্দর।'

'না, তা বলতাম না।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করলাম। এবার বলো তো— সুমা তোমাকে বেশি ভালোবাসে, না আমি বেশি ভালোবাসি ?'

'তুমি বেশি ভালোবাসো।'

'আমি বেশি ভালোবাসি ? আমি বেশি ভালোবাসলে তুমি সুমাকে সব কথা বলো কেন, আমাকে তো সব কথা বলো না। তুমি মিথ্যুক।' নিপা আবার গুনগুন করে কাঁদতে থাকে।

'আমি তোমাকে সব কথা বলি, নিপা।'

'না, বলো না।' নিপা খিলখিল করে হেসে ওঠে আবার, 'আমি তোমাকে একটা ছড়া শোনাব, শুনবে ?'

'রাত করে ছড়া শুনতে হবে না, কালকে দিনে শুনব।'

'একটা অনুরোধ করলাম।' নিপা চিৎকার করে উঠে বলে, 'সুমা অনুরোধ করলে তো ঠিকই শুনতে।'

নিপার দিকে ভালো করে তাকাই আমি। ওর চেহারাটা এখন ওর মতো নেই, কেমন যেন বাচ্চা বাচ্চা হয়ে গেছে, বাচ্চাদের মতো আহ্লাদি হয়ে গেছে ওর সবকিছু। ও যে হাত-পা নাচিয়ে নাচিয়ে এটা ওটা বলছে, সেটাও বাচ্চাদের মতো করে বলছে। অদ্ভুত মনে হচ্ছে আমার সবকিছু। অথচ নিপাকে আগে কখনো এমন দেখায় নি, ও আগে কখনো এরকম আচরণ করে নি। নিপা কি পাগল হয়ে যাচ্ছে ?

নিপার মাথার ঘন চুলের ভেতর একটা হাত ঢুকিয়ে দেই আমি। আস্তে আস্তে চুলগুলো বুলাতে থাকি। বাচ্চাদের ঘুমানোর আগে আগে যেমন করে, আমিও

তেমন করতে থাকি। মাথা নিচু করে ছিল নিপা, একটু পর আমার চোখের দিকে তাকায়। নিপার চোখগুলোকে এখন মৃত মানুষের চোখের মতো মনে হচ্ছে— নির্জীব, স্থির, ভাষাহারা।

লাফ দিয়ে নিপা উঠে দাঁড়ায় বিছানার ওপর। চিৎকার করে বলতে থাকে, 'আমি তোমাকে একটা নাচ দেখাব, আমি তোমাকে একটা নাচ দেখাব।'

নিপাকে জড়িয়ে ধরি আমি। ও আমার বুকে মাথা রেখে খুব আদুরে গলায় বলে, 'একটা জিনিস কিনে দেবে আমাকে?'

'কিনে দেব। কী জিনিস বলো?'

'বাচ্চাদের বই। আমি বাচ্চাদের পড়াব— অ তে অজগর ওই আসছে তেড়ে, আ তে আমটি আমি খাব পেড়ে, ই তে ইঁদুর ছানা...। আচ্ছা, তুমি বাচ্চাদের কোন বই কিনে দেবে?'

'ভালো বই কিনে দেব।'

'না, তুমি ভালো বই চেনো না। হায়াৎ রাস্তিকে ফোন করো তুমি। তিনি তোমাকে ভালো বইয়ের কথা বলে দেবেন।' নিপা কান্না কান্না চেহারা করে বলতে থাকে।

'ওনার তো ফোন নেই। আমি কালকে গিয়ে জিজ্ঞেস করব।'

'আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয় বলো তো? চলো আমরা ছাদে যাই। গিয়ে দুজন এক সঙ্গে ছাদ থেকে লাফ দেই। না না, এক সঙ্গে লাফ দেওয়া হবে না। এক সঙ্গে লাফ দেওয়ার কথা বলে আমি লাফ দেব আর তুমি ঠিকই ছাদের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি তখন মরে যাব, এই সুযোগে তুমি সুমাকে বিয়ে করবে। তাই না, সুমাকে বিয়ে করবে না?' নিপা আবার হাসতে শুরু করে। সমস্ত খাট কাঁপিয়ে সে হাসতে থাকে। আমি ওকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দেই, মাথায় হাত বুলাতে থাকি, গুনগুন করে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে থাকি। একটু পর ও ঘুমিয়ে পরে। কী সরল ওর ঘুম, কী প্রশান্তিময় ওর চোখ বুজে থাকা, কী ছন্দময় ওর শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা! অবিকল সকল দুশ্চিন্তামুক্ত বাচ্চার মতো দেখাচ্ছে ওকে এ মুহূর্তে।

নিপা ঘুমিয়ে পড়েছে। লাইটটা অফ করে আমিও যেই ঘুমাতে যাব, ঠিক সেই মুহূর্তে বাচ্চাটি বলে ওঠে— 'তুমি আমাকে মেরে ফেললে, বাবা!'

বিছানায় উঠে বসলাম আমি। যেদিক থেকে শব্দটা এসেছে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম আগ্রহ নিয়ে। বাচ্চা আবার বলে উঠল, 'তুমি আমাকে মেরে ফেললে, বাবা?'

'তুমি কে ? কে তুমি ?'

কথা বলে না বাচ্চাটা, খিলখিল করে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে দু'একটা লাফও দেয়। মেঝে থেকে লাফ দেওয়ার শব্দ পাওয়া যায়।

'বললে না তুমি কে ?'

বাচ্চাটা সারা ঘর দৌড়াতে থাকে আর খিলখিল করে হাসতে থাকে। কী সুন্দর হাসি! কী সুন্দর নরম পায়ের ছন্দ!

বিছানা থেকে নেমে আসি আমি। বাচ্চাটা এখনো দৌড়াচ্ছে, সারা ঘর দৌড়াচ্ছে। আমারও হঠাৎ ইচ্ছে জাগে দৌড়ানোর। বাচ্চাটার পায়ের শব্দের তালে তালে আমিও দৌড়াতে থাকি। বাচ্চাটা হাসছে, দৌড়াচ্ছে। আমি ওর পেছন পেছন দৌড়াচ্ছি। মনে হচ্ছে, আর একটু জোরে দৌড়ালেই বাচ্চাটাকে ধরতে পারব, কিন্তু ধরতে পারি না। ছুঁতে ছুঁতেও ওকে ছুঁতে পারি না। অনেকক্ষণ দৌড়ানোর পর আমি আবার বিছানায় বসে পড়ি। বাচ্চাটা এখনো দৌড়াচ্ছে, খিলখিল করে হাসছে।

হঠাৎ চুপ। কোনো শব্দ নেই ঘরের মধ্যে। আমি অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছি সামনের দিকে। বাচ্চাটা আবার কথা বলবে, হাসবে, দৌড়াবে। না, চুপচাপ কেটে যায় অনেকক্ষণ। পিঠে হঠাৎ স্পর্শ পেতেই পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি নিপা বসে আছে আমার পেছনে। ও যে কখন ঘুম থেকে উঠে বসেছে টেরই পাই নি। আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, 'বাচ্চাটার সঙ্গে অনেকক্ষণ দৌড়ালে, না ? ভালো লেগেছে তোমার ?'

কোনো কিছু বলি না আমি। অন্ধকারের মাঝেই নিপার দিকে তাকিয়ে থাকি। নিপা গুনগুন করে কাঁদছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

দরজার কাছে খুট করে একটা শব্দ হয়। নিপা কান্না থামিয়ে ঝট করে সেদিকে তাকায়, আমিও। দ্রুত লাইটটা জ্বালিয়ে দেখতে পাই তানজি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, ওর হাতে মস্ত বড় একটা পুতুল, লাল পুতুল। ও সেটা পরম আদরে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে!

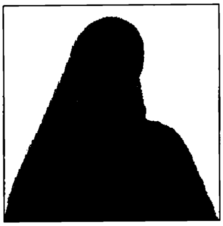

সকালবেলা ঘুম ভাঙল হায়াৎ রাস্তি সাহেবের ফোনে। তিনি বেশ আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'একটু আসতে পারবেন, জরুরি কিছু কথা ছিল।'

'কখন আসব ?'

'সকাল দশটার মধ্যে আসলেই চলবে। তারপর আমি থাকব না, জরুরি কাজে বাইরে যেতে হবে।'

'দশটার মধ্যেই চলে আসছি আমি।'

'আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। ওনার সঙ্গেও কথা বলতে হবে। আচ্ছা, একটা বিষয় আপনারা আমার কাছে গোপন করেছেন কেন ?' হায়াৎ রাস্তি সাহেব একটু গম্ভীর গলায় বললেন।

'কোন বিষয়টা ?'

'আমি ফোন-ফ্যাক্সের দোকান থেকে আপনার সঙ্গে কথা বলছি। এখান থেকে ফোনে বলা যাবে না বিষয়টা। আপনি আসুন, তখন বলব।'

হায়াৎ রাস্তি সাহেব ফোনটা রেখে দিলেন। একটু পর মোবাইলটা আবার বেজে উঠল। রিসিভ করতেই হায়াৎ রাস্তি সাহেব বললেন, 'একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আপনাকে ধন্যবাদ দেয়া হয় নি। কাল রাতে আপনি একটা ক্যাব ঠিক করে দিয়েছিলেন, ভালোভাবেই বাসায় পৌঁছতে পেরেছিলাম আমি। ধন্যবাদ আপনাকে।'

ফোনটা আবার রেখে দিলেন হায়াৎ রাস্তি সাহেব। পাশে ফিরে তাকিয়ে দেখি, নিপা নেই। ভাবলাম বাথরুম-টাথরুমে গিয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, না, নিপা আসছে না। বাথরুমে ও সাধারণত এতক্ষণ থাকে না। বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে কাছে গিয়ে ডাক দিলাম, 'নিপা ?'

কোনো উত্তর এলো না বাথরুমের ভেতর থেকে।

আমি আবার বললাম, 'নিপা ?'

উত্তর এলো না এবারও।

বাথরুমের দরজার নবে আস্তে করে মোচর দিলাম, দরজা খুলে গেল। নিপা নেই বাথরুমে। ঝট করে সামনের দরজার দিকে তাকালাম। দরজা বন্ধ, ছিটকিনিটাও লাগানো। তার মানে, নিপা বাইরেও যায় নি। রান্নাঘরে গেলাম, না, নিপা সেখানেও নেই। কোথায় গেল ? ভাবতে ভাবতে তানজির রুমে গিয়েই চমকে উঠি আমি। তানজির পাশে শুয়ে আছে নিপা। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ও, ওর ব্লাউজের সবগুলো বোতাম খোলা!

নিপার পাশে গিয়ে বসলাম আমি। ব্লাউজের বোতামগুলো আটকে দিতে দিতে ডাকলাম, 'নিপা ?'

নিপা পাশ ফিরে শুয়ে দু'হাত দিয়ে পা জড়িয়ে ধরে মাথা রাখল সেখানে। আমি ওর মাথায় হাত রাখলাম। একেবারে বাচ্চাদের মতো জড়িয়ে ধরেছে ও আমাকে। কী শান্ত চেহারা, কী মায়াময়! অথচ কাল রাতেই কী সব আবোলতাবোল বলল!

ছয়-সাত মাস আগে থেকেই নিপা অল্প অল্প বদলে যাচ্ছিল। আচার-আচরণটা পাল্টে যাচ্ছিল ওর, বিশেষ করে তানজির ব্যাপারে। আগে একটু পরপরই ওকে ধমক-ধামক দিত। এখন আর সেটা দেয় না। এমনকি বড় ধরনের কোনো ভুল করলেও কিছু বলে না। কিন্তু নিপা অসংলগ্ন কথা বলা শুরু করল হঠাৎ। অফিস থেকে একদিন বাসায় ফিরতেই ও খুব মিনতি নিয়ে বলল, 'আমি যদি এখন পুরো এক ঘন্টা হাসি, তুমি কি কিছু মনে করবে ?'

ব্যাপারটা প্রথমে আমি বুঝতে পারি নি। বললাম, 'নাহ্, তুমি হাসবে এতে আমার মনে করার কী আছে! হাসলে তো মানুষকে ভালো লাগে।'

'যদি কাঁদি ?'

ঝট করে একটু সোজা হয়ে দাঁড়াই আমি। নিপার দিকে ভালো করে তাকাই। একটু এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধ ছুঁয়ে বলি, 'কাঁদবে কেন ?'

'ইচ্ছে করছে।'

'ইচ্ছে করছে ? ইচ্ছে করলে কাঁদো।'

'আর যদি গায়ে আগুন লাগিয়ে দেই ?'

'কার ?'

'না না, তোমার না। আমার নিজের।'

'কেন, গায়ে আগুন লাগাবে কেন ?'

'এটাও ইচ্ছে করছে।'

নিপার কাঁধটা আমি একটু চেপে ধরি। খুব আন্তরিকভাবে বলি, 'কী হয়েছে তোমার ?'

নিপা হাসতে হাসতে বলে, 'কিছু না।'

'নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে।'

শব্দ করে হেসে উঠে নিপা, 'না, আমার কিছুই হয় নি। তোমাকে বরং একটা নাচ দেখাই আমি।'

শাড়িটা কোমড়ে পেঁচিয়ে নিপা হঠাৎ নাচতে শুরু করে। ছোটকালে ও নাচ শিখেছে, নাচটা এখনো মনে আছে ওর। একটু পর নাচটা থামিয়ে বলে, 'একটা হার্ড বিটের ইংলিশ গান ছাড়ো তো ক্যাসেটে, আমি এবার ইংলিশ নাচ নাচব।' কথাটা বলেই নিপা ওর শাড়িটা খুলতে থাকে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, 'এটা কী করছ নিপা ?'

'ইংলিশ নাচার প্রস্তুতি নিচ্ছি। শাড়ি পরে তো ইংলিশ নাচ নাচা যায় না, শাড়িটা খুলে ফেলি।'

'শাড়ি খুলে ফেললে মানুষ কী বলবে!' নিপা হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে।

'এখানে মানুষ পেলে কোথায় তুমি ?'

'তানজি আছে না।'

'তানজি আবার মানুষ হলো নাকি ? ও তো ছোট।' নিপা হাসতে থাকে।

'প্লিজ, তুমি শাড়ি খুলো না। অন্য কিছু করো।'

নিপা হঠাৎ কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'শাড়ি খুললে আমাকে আর তোমার ভালো লাগে না, না ?' নিপা কাঁদতে শুরু করে। চিৎকার করে কাঁদতে থাকে, সঙ্গে একনাগাড়ে জিনিসপত্র ভাঙতে থাকে ও।।

তারপর থেকে মাঝে মাঝেই এভাবে কথা বলে, হাসে, কাঁদে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, একটু পরই ভুলে যায় ও সব কিছু।

নিপা আমার হাঁটু জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়েই আছে। আমি ওর মাথার চুল বুলাতে বুলাতে বলি, 'নিপা, উঠবে ?' আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে নিপা উঠে বসতেই আবার বলি, 'এখানে শুয়েছ কেন তুমি ?'

'তোমার ওখানে শুতে ভাল্লাগছিল না।'

'আমাকে ডাকলে পারতে।'

'তুমি গভীরভাবে ঘুমাচ্ছিলে। আচ্ছা, তুমি কি জানো ঘুমালে তোমাকে কেমন দেখায় ? কাল রাতে মোবাইল দিয়ে একটা ভিডিও করেছি আমি। তুমি এমনভাবে হা করে ঘুমাও না, তোমার মুখের ভেতর মশা গিয়ে ডিম পেরে বাচ্চা ফুটালেও তুমি কিছু টের পাবে না। ভিডিওটা দেখবে ?'

'পরে দেখি।' আমি নিপার একটা হাত নিজের হাতে এনে বলি, 'ব্লাউজের বোতাম খুলে ফেলেছিলে কেন?'

'গরম লাগছিল।'

'এখানে ফ্যান চলছে, আমাদের ঘরে তো এসি আছে।'

'বললাম না, ওখানে শুতে ভালো লাগছিল না।' নিপা দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলে, 'জানো, বাজে একটা স্বপ্ন দেখেছি রাতে।'

'স্বপ্ন স্বপ্নই।'

'শুনবে না কী স্বপ্ন দেখেছি।'

'না, ওটা এখন বলতে হবে না। ওঠো তো, দশটার ভেতর হায়াৎ রাস্তি সাহেবের কাছে যেতে হবে।'

'রাতে না ওনার সঙ্গে দেখা হলো, আজ আবার কেন?

'উনি ডেকেছেন।'

নিপা আমার হাতটা চেপে ধরে আবদারের ভঙ্গিতে বলল, 'তার আগে স্বপ্নের কথাটা বলি। প্লিজ।'

স্বপ্নটা বলার জন্য নিপা আয়েশ করে বসল। তারপর হাতটা আরো চেপে ধরে বলল, 'দেখলাম, তুমি আরেকটা বিয়ে করে এনেছ। নতুন বউ এসে সালাম করছে আর মা বলে ডাকছে আমাকে।' নিপা খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে ও আমার ওপর গড়িয়ে পড়ে, তবুও ওর হাসি থামে না। ও হাসতেই থাকে। পাশ থেকে তানজি ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নিপার দিকে। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে ও, ভয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছে ওর হাতে থাকা পুতুলটাকে।

হায়াৎ রাস্তি সাহেব হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, 'আজ কথা বলব মূলত আপনার স্ত্রীর সঙ্গে। আপনার স্ত্রীর নাম হচ্ছে।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব পাশে রাখা আমাদের পূরণ করা ফর্মটা হাতে নেওয়ার আগেই নিপা বলল, 'আমার নাম নিপা, নিপা আহমেদ।'

'স্যরি নিপা, আমি প্রায় সব মনে রাখতে পারি, কিন্তু সহজে কারো নাম মনে রাখতে পারি না।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'একটা সুসংবাদ আছে।'

নিপা বরাবরের মতো আগ্রহ নিয়ে বলল, 'কী?'

'গতকাল যে ধাঁধাটা বলেছিলাম, তার সমাধানটা পেয়ে গেছি।'

'পেয়ে গেছেন!' নিপা আহ্লাদি ভঙ্গিতে বলে, 'বলুন না, প্লিজ।'

'ছেলে তিনটার হোটেলে বিল হয়েছিল মোট পঁচাত্তর টাকা। তিনজনে সমান সমান টাকা দিয়েছে, অর্থাৎ সবাই পঁচিশ টাকা করে দিয়েছে। তাই তো?'

'জি।' নিপা আগের মতোই উৎসাহী হয়ে বলল।

'তারপর হোটেল বয়টি হোটেল মালিককে টাকাটা দিতেই হোটেল মালিক পাঁচ টাকা কম নিয়ে ওই তিন ছেলেকে তা ফেরত দিতে বলল। হোটেল বয় টাকাটা ছেলে তিনজনকে ফেরত দিতেই তারা বয়কে দু'টাকা টিপস দিল, আর বাকি তিন টাকা এক টাকা করে তিন জন নিয়ে নিল।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব নিপার দেক তাকিয়ে বললেন, 'কী তাই তো?

'জি, তাই।'

'তাহলে তিনটাকা তিনজনে ফেরত পাওয়ার প্রত্যেকের খরচ দাঁড়াল চব্বিশ টাকা। আর একেকজনের চব্বিশ টাকা খরচ হলে তিনজনের মোট খরচ হয় তিন চব্বিশে বাহাত্তর টাকা।'

'হ্যাঁ।'

'তারপর তারা বয়কে দিয়েছে দু'টাকা। এবার মোট কত টাকা হলো?'

নিপা হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, 'আমাদের ভুলটা হয়েছে এখানেই। বয়কে দেওয়া দুই টাকার হিসেবটা আমরা দুই বার ধরেছি। আমি বরং হিসেবটা প্রথম থেকে করি। ওই তিন ছেলে খাবারের দাম হিসেবে পরিশোধ করেছে পঁচাত্তর টাকা। পাঁচ টাকা ফেরত পাওয়ার পর দাঁড়াল সত্তর টাকা। বয়কে দিয়েছে দুই টাকা। ওদের মোট খরচ দাঁড়াল সত্তর যোগ দুই বাহাত্তর টাকা। আর বাকি তিন টাকা তিন জনে ভাগে করে নিয়েছে। ব্যস, মিলে গেল হিসেবটা।' কথাটা শেষ করেই নিপা হায়াৎ রাস্তি সাহেবের দিকে তাকায়।

হেসে ফেলেন হায়াৎ রাস্তি সাহেব, 'বাহ্, এত সহজে ব্যাপারটার সমাধান করে ফেলেছেন আপনি, যেটা আমি পারি নি।'

'না, আপনার কথাটা ঠিক না। এ ধাঁধাটা আপনার নিজের তৈরি, আর যেহেতু আপনার তৈরি, আপনি এর উত্তরটাও জানেন। আপনি শুধু আমাদের মেরিট টেস্ট করার জন্য এ ধাঁধাটা বলেছেন।'

হায়াৎ রাস্তি এবার ঝুঁকে বসলেন নিপার দিকে, 'আপনার একাডেমিক রেজাল্ট জানতে পারি?'

'জি। আমি ক্লাস ফাইভ, এইটে বৃত্তি পেয়েছিলাম, ম্যাট্রিকে এবং ইন্টারে ভালো রেজাল্ট করেছিলাম, অনার্সে হয়েছিলাম ইলেভেন, আর মাস্টার্সে হয়েছি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।'

'আপনার সাবজেক্ট কী ছিল ?'

'বোটানি।'

'বলুন তো— লতানো গাছকে স্বাভাবিকভাবে বাড়তে দেওয়া হলে এটা কীভাবে পেঁচিয়ে উঠবে ?'

'ঘড়ির কাটার বিপরীত দিক দিয়ে।'

'গুড। পৃথিবীতে কোনো লতানো গাছকেই বাম দিক দিয়ে পেঁচিয়ে উঠতে দেখা যায় না, সব লতানো গাছই ডানদিক দিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে। আপনি বুদ্ধিমতী।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব চেয়ারে ঠেস দিয়ে বললেন, 'আপনাকে এবার আমি কিছু প্রশ্ন করব, উত্তরটা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে দিতে হবে। রাজি ?'

'জি, রাজি।'

'আপনার সময় নেব আমি মাত্র পনের মিনিট।'

হায়াৎ রাস্তি সাহেব আমার দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, 'আমাকে বাইরে যেতে হবে ?'

হায়াৎ রাস্তি সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনিও বুদ্ধিমান।'

হায়াৎ রাস্তি সাহেবের রুম থেকে বের হয়ে এলাম আমি। কিন্তু পাঁচ-ছয় মিনিট পর তিনি আবার আমাকে রুমে ডেকে বললেন, 'এখানে হবে না। আমি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে পুরো এক ঘণ্টা রিকশায় ঘুরব। আমাদের আশপাশে যে বড় বড় গাছে ঘেরা ছায়া-শীতল রাস্তা আছে, সেই রাস্তাগুলোতে ঘুরব, আর তাকে প্রশ্ন করব। আপনার আপত্তি আছে ?'

আমার হাসির সঙ্গে সঙ্গে হায়াৎ রাস্তি সাহেবও হেসে ফেললেন এবং হাসতেই হাসতেই রুম থেকে বের হয়ে এলেন। রিকশায় ওঠার আগে নিপা আমার কাছে এসে এমনভাবে তাকাল, এরকম প্রত্যেকবার তাকানোতে আমি প্রতিবার মরে যেতে পারি, নির্দ্বিধায় চুপচাপ মরে যেতে পারি এ মায়াবতী মেয়েটার জন্য!

রীতা ভাবি কিছুটা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'কখন থেকে কলিং বেল বাজাচ্ছি, কোথায় ছিলেন ভাই আপনি ?'

'বাথরুমে ছিলাম, ভাবি।'

'স্যরি। আপনার ভাই অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে খুঁজছিল। কী জানি জরুরি কিছু কথা বলবে আপনার সঙ্গে। এর আগেও কয়েকবার এসেছিলাম, পাই নি। বাইরে গিয়েছিলেন আপনি ?'

'জি।'

'ভাবি ?'

'ও এখনো বাইরে আছে। একটু পরেই এসে পড়বে।'

'আপনি কি এখন ব্যস্ত ?'

'না, তেমন না।'

'একটু আসবেন তাহলে আমাদের বাসায়। মানুষটা কেমন যেন করছে।' রীতা ভাবি বেশ কাতর গলায় বলেন।

মোর্শেদ ভাইয়ের ঘরে ঢুকেই দেখি, বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন তিনি। মাথাটা সোজা, চোখ দুটো সিলিং বরাবর তাকানো। হাত দুটো দু'পাশে এমনভাবে রেখেছেন যেন ও দুটো মরা মানুষের হাত। তিনি শুয়েও আছেন মরা মানুষের মতো, স্থির, একদম স্থির।

ভাবি আমাকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে মোর্শেদ ভাইকে বললেন, 'রাহাত ভাই এসেছেন। তুমি কি উঠতে পারবে ?'

স্থির হয়ে শুয়ে থেকেই মোর্শেদ ভাই ডান হাতটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। তাকে খুব অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে আমার কাছে। আমি একটু ঝুঁকে বসে বললাম, 'কী হয়েছে আপনার, মোর্শেদ ভাই ?'

মাথা সোজা রেখে আর চোখ সিলিংয়ের দিকে রেখেই তিনি বললেন, 'বাথরুমে পড়ে ব্যথা পেয়েছি। অল্পের জন্য মেরুদণ্ডে ফ্যাকচার হয় নাই। ডাক্তার বলেছে, এক মাস কমপ্লিট রেস্ট নিতে হবে।'

'বাথরুমে না কয়েক দিন আগে পরে গেলেন। আবার পরে গেলেন কীভাবে?' মোর্শেদ ভাইয়ের হাতটা আমি চেপে ধরি।

'আর বলবেন না। আপনার বারান্দায় তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক রকম নেশা হয়ে গেছে। রাতে আর এখন ঘুম আসে না।'

'ঘুম আসে না মানে?'

'বাথরুমে দাঁড়িয়ে সারারাত আপনার বারান্দার দিকে তাকিয়ে থাকি। মজার ব্যাপার কি জানেন, আপনার ভাবিও এখন তাকিয়ে থাকে।'

ব্যাপারটা তো আমি আর নিপা জানি। তবুও বললাম, 'তাই নাকি!'

'দুজন একসঙ্গে তো বাথরুমের ওই ছোট জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকা যায় না। তাই পালা করে দুজন তাকিয়ে থাকি। একঘণ্টা আমি তাকিয়ে থাকি, পরের এক ঘণ্টা আপনার ভাবি তাকিয়ে থাকে। কাল শেষ রাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ঝিমুনি এসে যায়। ঠাস করে পড়ে যাই বাথরুমের মেঝেতে। হাই কমোডের কোনায় লেগে পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা পাই।' মোর্শেদ ভাই কথা বলছেন, আর অল্প অল্প কোকাচ্ছেন।

রীতা ভাবি একটা ট্রে হাতে নিয়ে এ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন, 'তুমি এত কথা বলছ কেন, তোমাকে না ডাক্তার কথা কম বলতে বলেছে?'

'ডাক্তাররা এরকম বলেই। দেখলে না, আমাদের সামনেই একটা রোগীকে ধূমপান করতে নিষেধ করলেন। একটু পর তিনিই আবার বারান্দায় গিয়ে সিগারেট টেনে এলেন। তাছাড়া রাহাত সাহেবকে আমি ডেকে এনেছি কি এমনি এমনি চুপচাপ বসিয়ে রাখার জন্য? ওনার সঙ্গে আমার আজ অনেক কথা আছে, প্রচণ্ড জরুরি কিছু কথা আছে।' মোর্শেদ ভাই বিছানা থেকে ওঠার চেষ্টা করতে করতে রীতা ভাবিকে বললেন, 'আমাকে একটু ধরো তো, পিঠের নিচে একটা বালিশ দিয়ে খাটের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাও।'

রীতা ভাবি খুব যত্ন করে মোর্শেদ ভাইকে খাটে ঠেস দিয়ে বসাতেই তিনি চেহারাটা ম্লান করে বললেন, 'বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে, রাহাত ভাই। মানুষ মরে দামি দামি গাড়ির নিচে পড়ে, আর আমি মরি বাথরুমের মেঝেতে পড়ে। অত কথা বাদ, আপনাকে এবার আসল কথাটা বলে ফেলি।' মোর্শেদ ভাই ভাবির দিকে তাকালেন, 'ওনাকে চা দিচ্ছ না কেন তুমি! চা তো ঠান্ডা হয়ে গেল, ঠান্ডা শরবত খাবেন নাকি তিনি!' মোর্শেদ ভাই দু'হাত দিয়ে আরো একটু সোজা হয়ে বসে বললেন, 'আমার আসল কথাটা হচ্ছে, আমার যে এই ফ্ল্যাটটা আছে এটা আপনি বিক্রি করার ব্যবস্থা করে দেন।'

'এটা কী বলছেন, মোর্শেদ ভাই! ফ্ল্যাট বিক্রি করবেন কেন আপনি ?'

'শুধু এ ফ্ল্যাট না, আমার আরো যা সহায়সম্পত্তি আছে সব বিক্রি করে দেবেন আপনি। আমি আমার নিজের কোনো কিছু রাখব না।' মোর্শেদ ভাই বেশ উত্তেজিত হয়ে যান।

রীতা ভাবি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, 'ডাক্তার না তোমাকে উত্তেজিত হতে নিষেধ করেছে ?'

'রাখো তোমার ডাক্তারের নিষেধ। আমাকে কথা বলতে দাও। শোনেন ভাই—।' মোর্শেদ ভাই খপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরে বলেন, 'আমাদের দুজনের কিন্তু লাভ ম্যারেজ। কোনো পক্ষের ফ্যামিলি রাজি না হওয়াতে আমরা কোর্টে গিয়ে একা একাই বিয়ে করি।'

'বলেন কী! ইন্টারেস্টিং!'

'আমরা ভেবেছিলাম, বিয়ের পর সবাই মেনে নেবে। কিন্তু কেউই মেনে নেয় নি। এক কাপড়ে আমরা দুজন ঢাকায় চলে আসি। তারপর টানা সতের বছর কঠোর পরিশ্রম করে এখানে আসতে পেরেছি। আমার হাতের তালুতে এখনো ইট ভাঙার দাগ আছে। পুরো দেড় দিন আমরা না খেয়ে ছিলাম।'

'তোমাকে এসব কথা কে বলতে বলেছে।' রীতা ভাবি রেগে যান।

'বলব না! ওনাকে সব বলব। দু ফ্যামিলির সবাই যখন জানতে পারে ঢাকায় আমাদের একটা অবস্থান হয়েছে, তখন সবাই আস্তে আস্তে কাছে আসতে শুরু করে। আমার এসব সহ্য হয় না, রাহাত সাহেব। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচব না। এত সব সম্পত্তি রেখে মারা গেলে এই মেয়েটাকে সবাই কামড়ে খাবে, কোনো কিছুই ওর দখলে রাখতে দেবে না। তাই আমি ঠিক করেছি, সব বিক্রি করে এই অসহায় মেয়েটির অ্যাকাউন্টে সব টাকা রেখে দেব। কিন্তু টাকাগুলো এমনভাবে রাখব, যাতে ও মারা যাওয়ার পর টাকাগুলো বারো ভূতে ভোগ না করতে পারে, একটা এতিমখানা যেন টাকাগুলো পেয়ে যায়। এবার বলুন তো ভাই, ভাবনাটা আমি ঠিক ভেবেছি, না অঠিক ভেবেছি ?' মোর্শেদ ভাই খুব আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকান।

'ঠিক, অঠিকের ব্যাপারটা পরে আসুক, মোর্শেদ ভাই। আপনি হঠাৎ করে এরকম ডিশিসন একটা নিলেন কেন ?'

'হঠাৎ করে না ভাই। আমার মনে হচ্ছে আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। ইদানীং আমাদের দু'পক্ষের আত্মীয়স্বজনের ঘনঘন আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে। সবাই আড়ালে আবডালে ফুসুর ফুসুর করে। আমাদের তো কেউ দেখতে আসে না, সবাই তাকিয়ে আছে আমাদের সম্পত্তির দিকে।' মোর্শেদ ভাই চিৎকার করে

কেঁদে ওঠেন, 'আল্লা পাক আমাদের একটা সন্তান দিল না। একটা ন্যাংড়া, খোড়া দিলেও খুশি হতাম, তাও দিল না।'

মনটা খারাপ হয়ে যায় আমার। একজন বয়স্ক মানুষ কাঁদছেন, একটা সন্তানের জন্য কাঁদছেন, বড় মর্মান্তিক মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। রীতা ভাবি পাশে বসে আছেন, তিনিও কাঁদছেন। আঁচলে মুখ ঢেকে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

মোর্শেদ ভাই বেশ কিছুক্ষণ কাঁদার পর হঠাৎ মুখটা উজ্জ্বল করে বলেন, 'কালকে বাথরুমে কীজন্য পড়ে গেছি জানেন?'

'কীজন্য মোর্শেদ ভাই?'

'ভোর রাতের দিকে তাকিয়ে দেখি ওই বাচ্চাটা লাফাচ্ছে।'

'কোন বাচ্চাটা?'

'ওই যে ওই বাচ্চাটা। যে বাচ্চাটা আপনার বারান্দায় লাফায় আর খেলে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় কি জানেন, ওই বাচ্চাটার কোলে একটা পুতুল ছিল, সম্ভবত লাল পুতুল ছিল।'

'তাই নাকি!'

'আপনার ভাবি তখন ঘুমিয়ে ছিল, ওকেও খুব দেখানোর শখ ছিল। কিন্তু ওকে ঘুম থেকে ডেকে এনে দেখি বাচ্চাটা নেই। অল্পের জন্য বেচারিকে বাচ্চাটা দেখাতে পারলাম না।' মোর্শেদ ভাই আমার হাতটা আবার জোরে চাপ দিয়ে বলেন, 'একটা কাজ করেন না ভাই। আপনি তো আপনার বারান্দাটা আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পারবেন না। রাতে আপনি আমাদের বাসায় চলে আসুন। এক সঙ্গে বাথরুমে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটাকে দেখব। ভাবিকেও আনতে পারেন আপনি।'

'দেখি, আপনার ভাবির সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

'দেখাদেখির কিছু নাই ভাই, আমাদেরও বাচ্চা কাচ্চা নাই, আপনাদের বাচ্চা কাচ্চা নাই। সারারাত ভরে বাথরুমে দাঁড়িয়ে থাকলে কোনো অসুবিধা হবে না। দেখেন, আপনার খুব ভালো লাগবে।'

'আপনার ঘরটা আমার ভালো লেগেছে, মোর্শেদ ভাই। সারা ঘর বাচ্চাদের ছবি দিয়ে ভরা।'

'শুধু বাচ্চাদের ছবি না ভাই।' মোর্শেদ ভাই ভাবিকে বললেন, 'কেবিনেটগুলো খুলে দেখাও তো ওনাকে।'

ভাবি উঠে এসে একটা একটা করে কেবিনেটের দরজা খোলেন, আর আমি অবাক হয়ে যাই। সারা কেবিনেট পুতুল দিয়ে ভরা। বিভিন্ন রঙের পুতুল। ছোট বড় হরেক রকমের পুতুল।

'ভাই, আমি যেখানে যাই, আর কিছু না আনি, একটা পুতুল অন্তত কিনে আনি। বাসায় এসে পুতুলটা কেবিনেটের ভেতর রাখি আর ভাবি, যদি আল্লাপাক কোনো সন্তান দেয়, তাহলে ওকে এসব পুতুল দিয়ে ঢেকে দেব।' দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে মোর্শেদ ভাই আবার কেঁদে ফেলেন। দু'চোখ ভরে গেছে তার পানিতে।

বাসায় ফিরেই দেখি সুমা আর নিপা চুটিয়ে গল্প করছে একসঙ্গে। আমাকে দেখেই নিপা বলল, 'তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে, জানি। রীতা ভাবিদের বাসায় এতক্ষণ কী করলে?'

'মোর্শেদ ভাই বাথরুমে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছেন।'

'আবার!'

'তোমাদের দুজনের দেখা হলো কোথায়?'

'আজ আমি অফিসে যাই নি। আমার এক খালার বাসায় যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি নিপা একা একা রিকশায় করে আসছে। খালার বাসায় যাওয়া বাদ দিয়ে ওর সঙ্গে চলে এলাম।' সুমা হাসতে হাসতে বলে।

'হায়াৎ রাস্তি সাহেব তোমাকে একা ছেড়ে দিয়েছেন?' নিপাকে বলি আমি।

'হ্যাঁ, ওনার দরকারি প্রশ্নের উত্তর জানার পর উনি বললেন, এবার আপনি যেতে পারেন। আমি চলে এলাম।'

'তোমাকে কী কী প্রশ্ন করেছে তা কি জানা যাবে?'

চেহারাটা গম্ভীর করে ফেলে নিপা। মাথাটা নিচু করে বলে, 'ওসব তোমাকে বলতে চাচ্ছি না, রাহাত। আবার হয়তো একসময় বলেও ফেলতে পারি। কারণ, তোমার সঙ্গেই তো আমার স-ব গল্প। দুঃখ, কষ্ট, ভালোবাসার গল্প।' কথাটা শেষ করেই নিপা হেসে ফেলে, 'অনেকগুলো মজার প্রশ্ন করেছিলেন তিনি আমাকে। তার মধ্যে একটা প্রশ্ন হচ্ছে— আমার বিয়ে হয়েছে কয়বার?' নিপা আগের চেয়ে শব্দ করে হেসে ওঠে।

নিপার চোখের দিকে তাকাই আমি। ও ঠিক হাসছে না, হাসার মতো ভান করছে। সুমা উঠে গিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে নিপা আমার বুকের কাছে এসে বলল, 'আমার কিছু গোপন ব্যাপার আছে, যদি তুমি জেনে ফেল, তখন কি তুমি আমাকে ঘৃণা করবে?'

'না।'

'কেন?'

নিপার মুখটা দু হাত দিয়ে তুলে বলি, 'প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই একটা গোপন অতীত থাকে।'

'আমি যদি তোমাকে আমার সেই গোপনগুলো জানিয়ে দেই?'

'আমি শুনব না।'

'কেন?'

'কারণ গোপন ব্যাপার গোপন থাকাই ভালো।'

হায়াৎ রাস্তি সাহেব নিপাকে বলেছিলেন, আমরা যেন সন্ধ্যার পর ওনার সঙ্গে একবার দেখা করি। কিন্তু ওনার বাসায় গিয়ে দেখি, বাসাটা বাইরে থেকে তালা লাগানো। ফ্ল্যাটের দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করা হলো, কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না তিনি। তবে এটা বললেন, হায়াৎ রাস্তি সাহেব নাকি মাঝে মাঝে দু-চার দিনের জন্য উধাও হয়ে যান।

পরের দিন আমরা আবার গেলাম। সেদিনও দরজায় তালা লাগানো। নিপা হঠাৎ মন খারাপ করে বলল, 'মানুষটা যেন কেমন, অবিকল বাবাদের মতো, না?'

তিনদিন পর হায়াৎ রাস্তি সাহেব বাসায় এসে উপস্থিত। অসম্ভব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। সোফায় বসেই তিনি নিপাকে বললেন, 'বাসায় লেবু আছে ?'

কোনো জবাব না দিয়ে দ্রুত নিপা কিচেনে চলে গেল। প্রায় তার চেয়ে দ্রুত বড় গ্লাসটা ভরে শরবত বানিয়ে হায়াৎ রাস্তি সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার কী হয়েছে ?'

'না, তেমন কিছু না।'

'শরীর ভালো আছে তো আপনার ?'

'এ বয়সে শরীর যেরকম থাকে, সেরকমই আছে।'

'আপনাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, কিছুটা কেমন দেখারই কথা।' গ্লাসের শরবতটুকু শেষ করে হায়াৎ রাস্তি সাহেব বললেন, 'মতিঝিল দিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ দেখি এক জায়গায় ভীষণ ভিড়। কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা অল্প বয়সি ছেলে পড়ে আছে রাস্তায়। সারা শরীর রক্তে জর্জরিত। আশপাশের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, কার যেন একটা মানিব্যাগ ছিনতাই করে পালাচ্ছিল ছেলেটা। কিন্তু ধরা পড়ে যায়। পাবলিক তখন তাকে মেরে ফেলে!' হায়াৎ রাস্তি সাহেব খুব করুণ গলায় বলেন, 'আমার কখনো বিশ্বাস হয় না কয়েকজন মানুষ কিংবা একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে গলা টিপে, ছুরি দিয়ে আঘাত করে, গুলি করে কিংবা পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে! একটা মানুষকে প্রথম আঘাত করার পর সে যখন চিৎকার করে ওঠে, চোখে-মুখে সমস্ত ভয় ফুটিয়ে তুলে কাতর মুখে মিনতি করে, তারপর তাকে আঘাত করা কীভাবে সম্ভব! আমার মাথায় আসে না।' হায়াৎ রাস্তি রাহেব নিপার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আরেক গ্লাস শরবত দেওয়া যাবে ?'

পাশে রাখা গ্লাসটা নিয়ে নিপা আবার কিচেনে যায়। সেটা আবার ভর্তি করে আনতেই হায়াৎ রাস্তি সাহেব ঢকঢক করে সবটুকু গিলে ফেললেন একবারেই। খালি গ্লাসটা পাশে রেখে তিনি বললেন, 'একবার আমি আমার তিনতলা বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা ছেলে, কত আর বয়স হবে, বিশ-বাইশ বছর। দৌড়ে আসছে সে। তার পেছনে পেছনে আরো চার-পাঁচজন ছেলে।

ওদের প্রত্যেকের হাতে দা-চাপাতি। আমার এক বাসা পরেই ছেলেটাকে ধরে ফেলল তারা। তারপর উপর্যপুরি দা-চাপাতি দিয়ে আঘাত করতে লাগল তাকে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ছেলেটাকে মেরে ফেলল তারা। কী নির্মম! একটা তরতাজা মানুষকে প্রকাশ্য দিবালোকে মেরে ফেলল হিংস্র কিছু মানুষ! নিজের চোখে দেখলাম আমি, কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছিল না সবকিছু। মানুষ কীভাবে পারে? তারপর চার-পাঁচ দিন আমি তেমন কিছু খেতে পারি নি। আচ্ছা, আপনারা আমার বাসায় গিয়েছিলেন?'

'জি।' আমি বললাম।

'স্যরি, আমি একটা জরুরি কাজে বাইরে গিয়েছিলাম।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব সোফায় হেলান দিয়ে বসে পা দুটো সামনে মেলে দিয়ে বললেন, 'আমার বাবা একটা কাজ শুরু করে গিয়েছিলেন। কাজটা এখন আমাকে করতে হচ্ছে। একটা এতিমখানা খুলে গিয়েছিলেন বাবা। প্রতিদিন আমার কাছে অন্তত বিশজন করে মানুষ আসে। তারা প্রত্যেকে একশ' টাকার একটা নোট ফেলে রেখে যায় আমার ঘরের ওই কাচের বাক্সে। আপনারা যেরকম ফেলেছিলেন। এই টাকা আর আমার কিছু বন্ধু-বান্ধবের অনুদান দিয়ে এতিমখানাটা চালাই আমি। আমার এতিমখানায় বড় বড় পাঁচ-ছয়টা গাছ আছে। তিন-চার দিন আগে খবর পেলাম নতুন একটা ছেলে নাকি এসেছে এতিমখানায়। প্রতিরাতে চুপিচুপি সেই ছেলেটা ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে ওইসব বড় বড় গাছে উঠে গাছের ডাল কাটতে থাকে।'

'কেন?' নিপা একটু সোজা হয়ে বসে বলে।

'সেটা জানার জন্যই তিনদিন ওখানে ছিলাম।'

'ডালটা সে কাটে কী দিয়ে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'কোথা থেকে সে একটা দা যোগাড় করেছে, সেটা দিয়ে কাটে। দাটা মস্ত বড় এবং এত চকচকে, মনে হয় ছেলেটা প্রতিদিন সেটা ধার দেয়। তো সেখানে গিয়ে ছেলেটাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি আমি। একদিন রাতে সে গাছে উঠতেই তাকে হাতে নাতে ধরে নামানো হয়। আমার সামনে বসিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি গাছে উঠে ডাল কাটো কেন বলো তো? ছেলেটা খুব চটপট করে উত্তর দেয়, গাছের ডাল আমার ভালো লাগে না। আমি আবার জিজ্ঞেস করি, কেন? ডাল দেখলে আমার রাগ হয়। ছেলেটার মাথায় হাত রেখে বলি, ডাল দেখে তোমার রাগ হয় কেন? তারপর সে আর কিছু বলে না।'

'ব্যাপারটা কী?'

'ব্যাপারটা খুব করুণ। ছেলেটার বাবা-মা একদিন ঝগড়া করে দুজন একসঙ্গে ফাঁস নেয় একটা গাছের ডালে। ছেলেটা তারপর থেকে গাছের ডাল

দেখলেই কাটতে চায়। সে মনে করে, তার বাবা-মায়ের মৃত্যুর জন্য গাছের ডাল দায়ী।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে চোখ দুটো বুজে ফেলেন।

'আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সম্ভবত আপনার ঘুম পাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তিন রাত ভালো ঘুমাতে পারি নি। একটু ঘুমানো দরকার। আপনাদের এখানে ঘুমানো যাবে?'

'অবশ্যই।'

নিপা আমাদের বেডরুমে গিয়ে কেবিনেট থেকে নতুন চাদর, বালিশ বের পাশে রুমে চলে যায়। দ্রুত সবকিছু ঠিক করে এসে বলে, 'কোনো রকম দ্বিধা না করে আপনি এখানে ঘুমাতে পারেন। মনে করুন আপনি আপনার মেয়ের বাড়িতে ঘুমাচ্ছেন।'

ঝট করে হায়াৎ রাস্তি সাহেব নিপার দিকে তাকান। কেমন যেন ছলছল করে ওঠে তার চোখ দুটো। কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে তিনি পাশের রুমে চলে যান।

পুরো সাত ঘণ্টা ঘুমানোর পর হায়াৎ রাস্তি সাহেব উঠে বললেন, 'আমি আরো এক গ্লাস শরবত খাব। তার আগে আমি একটু গোসল করতে চাই। কোনো সমস্যা নেই তো?'

নিপা পরম মমতা নিয়ে হায়াৎ রাস্তি সাহেবের একটা হাত ধরল। বুড়ো বাবাকে বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েরা যেমন যত্ন করে, তেমন যত্ন করে বাথরুমের দিকে নিয়ে গেল তাকে। তারপর ওয়ারড্রোব থেকে নতুন একটা তোয়ালে, নতুন একটা সাবান দিল বাথরুমে।

হায়াৎ রাস্তি সাহেব বেশ সময় নিয়ে গোসল করলেন। বাথরুম থেকে প্রশান্তি নিয়ে বের হয়ে তিনি বললেন, 'এখন কয়টা বাজে?'

'সাড়ে দশটা।'

'রাত তো অনেক হয়েছে।' সোফায় গিয়ে বসতে বসতে তিনি বললেন, 'আপনারা দুজন এখন আমার সামনে বসুন। আপনাদের সমস্যাটা সম্ভবত আমি বের করে ফেলেছি।'

ফ্রিজ থেকে শরবতের গ্লাসটা এনে হায়াৎ রাস্তি সাহেবকে দিয়ে নিপা সামনের সোফাটাতে বসল, আমি বসলার ওর পাশে। গ্লাসে চুমক দিয়ে হায়াৎ রাস্তি সাহেব বললেন, 'আপনারা এক সময় খুব ঝগড়া করতেন, না?'

নিপা বেশ আগ্রহী হয়ে বলল, 'খুব না, মাঝে মাঝেই ঝগড়া হতো আমাদের।'

'সেটা খুব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে।'

আমি একটু সোজা হয়ে বসে বলি, 'জি।'

'ব্যক্তিগত জীবনে আপনি খুব গুছানো।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'নিপা খুব অগোছালো।'

'আমাদের ঝগড়াটা হতো মূলত এটা নিয়েই।'

'ব্যাপারটা একটু উল্টো হয়ে গেছে। সাধারণত মেয়েরা খুব গুছানো হয়, ছেলেরা হয় অগোছালো। হতেই পারে। জগতে প্রতিদিন অনেক কিছুই হয়, সেগুলোর কতকটা দরকারি, কতকটা অদরকারি। এই গুছানো-অগোছালো ব্যাপারটা নিয়ে নিপা সবসময় টেন্‌স থাকত।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব নিপার দিকে হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে বলে, 'নিপা, ঠিক?'

'ঠিক। আমার সব সময় টেনশন হতো রাহাতকে নিয়ে। ঠিক ওকে নিয়ে না, অফিস থেকে এসেই যদি ও বাসায় সামান্য উল্টো পাল্টা দেখত, রেগে যেত। মাঝে মাঝে এমন যেগে যেত দু'তিনদিন কথাই বলত না আমার সঙ্গে।'

'এরই মধ্যে আপনাদের কাজের মেয়ে, কী যেন নাম।'

'তানজি।'

'তানজি। তানজি খুব বোকা ধরনের একটা মেয়ে। আপনাদের কথা তেমন বুঝতে পারত না, যা বলতেন তা করতে পারত না। কিছুটা ডিস্টার্বিং। আপনার স্বামীর ওপর রাগ কিংবা অভিমানটা এসে পড়তো আপনাদের কাজের মেয়েটার ওপর। একটু এদিক-সেদিক হলেই ওকে তাই চর-থাপ্পড় মারতেন। ঠিক?' হায়াৎ রাস্তি সাহেব হাসতে থাকেন।

নিপা অস্ফুট স্বরে বলে, 'জি।'

হায়াৎ রাস্তি সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কিন্তু আপনি তানজিকে ভালোবাসেন, ভালো অবশ্য নিপাও বাসে। একটা ছোট এতিম মেয়ে হিসেবে ওকে বেশ স্নেহ করেন আপনি। কিন্তু একদিন একটা ঘটনা ঘটে যায়।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব খুব গভীরভাবে দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কিচেনে কাজ করতে করতে নিপা একদিন তার হাতের চামচ দিয়ে তানজিকে আঘাত করে। আঘাতটা সে সেভাবে করতে চায় নি, কিন্তু চামচটা গিয়ে লাগে তানজির চোখের নিচে। কেটে যায় সেই জায়গা, গলগল করে রক্ত পড়তে থাকে।'

নিপা আগের মতোই অস্ফুট স্বরে বলে, 'জি।'

হায়াৎ রাস্তি সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, 'ব্যাপারটা আপনাকে খুব আঘাত দেয়। নিপা তখন ক্যারি করছিল। আপনি তখন মুখ ফসকে একটা কথা বলে ফেলেন, তানজির অভিশাপে আপনার সন্তানের যদি কিছু হয়, তাহলে নিপাকে আপনি ত্যাগ করবেন। এরকমই তো কিছু বলেছিলেন, না?'

অপরাধী স্বরে আমি বলি, 'জি।'

'যথা সময়ে আপনাদের একটা সন্তান হয় এবং মারা যায় সে। আপনাকে জানানো হয়েছিল ডাক্তারের অদক্ষতায় এটা হয়েছে। ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। নিপার ডেলিভারির সময় আপনার শাশুড়ি নিপার পাশে ছিলেন, আর সন্তানটা হয়েছিল অসম্পূর্ণ, দুটো হাত ছিল না তার, কিন্তু সুস্থ ছিল সে। আপনি যে নিপাকে কথাটা বলেছিলেন সেটা আপনার শাশুড়ি জানতেন। সেটা সিরিয়ারসলি নিয়ে, মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, সেই সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুটাকে কোনো একটা উপায়ে মেরে ফেলেন তিনি। দেরিতে হলেও আসল ব্যাপারটা জেনে ফেলেন আপনি। তারপর থেকেই অপরাধবোধে ভুগতে থাকেন এবং এক সময় আপনার মনে হতে থাকে আপনার ওই শিশুটা এসে আপনাকে বলছে, তুমি আমাকে মেরে ফেললে, বাবা!' হায়াৎ রাস্তি সাহেব চোখ দুটো বুজে ফেলে সোফায় ঠেস দিয়ে বসেন।

নিপা কাঁদছে। ফোত ফোত শব্দ করছে ও। আমি আমার মতোই থাকি—সেই চিনচিনে কষ্ট, সেই অব্যক্ত বেদনা।

'মানুষ যে কেন সবকিছু এত সিরিয়ালি নেয়! বিশ্বে প্রতিদিন অন্তত কয়েক হাজার কোনো না কোনো অঙ্গহীন, ঠোঁট কাটা, প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম নেয়। এগুলো কোনো অভিশাপ? মোটেও না।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব আমার দিকে একটু ঝুঁকে এসে বলেন, 'আপনাকে এসব ভুলে যেতে হবে, মিস্টার রাহাত। আর নিপা।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব নিপার দিকে তাকান, 'আপনাকেও। আপনি আজকাল চা বানাতে বেশ মিষ্টি ব্যবহার করেন। তরল কিছু বানাতে গেলেই আপনার মনে হয় আপনি আপনার বাচ্চার জন্য দুধ বানাচ্ছেন, আপনি একটা ঘোরের মধ্যে থাকেন। আমার জন্য যে শরবত বানিয়েছিলেন সেটাতেও মিষ্টি ছিল প্রচুর। আর।' দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তানজি। হায়াৎ রাস্তি সাহেব ওর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ওর কাছে যে প্রায়ই পুতুল পাওয়া যায়, তা কিন্তু আপনিই দেন ওকে। ও রাতে ঘুমিয়ে থাকলে ওর পাশে গিয়ে রেখে আসেন আপনি পুতুলটা। এটা না করলেই হয়, অপরাধবোধে ভোগার কোনো মানে হয় না।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব উঠে দাঁড়ান, 'আপনাদের ছাদ আছে না, চলুন কিছুক্ষণ ছাদে কাটিয়ে আসি।'

ছাদে এসে ছাদের রেলিং ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন হায়াৎ রাস্তি সাহেব। আকাশে প্রায় পূর্ণ চাঁদ। চাঁদ দেখতে দেখতে তিনি আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'এরকম একটা দিনে আমার বৌ আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তেতাল্লিশ বছর আগে।'

নিপা কিছুটা শব্দ করে বলে, 'কী ?'

'না না, অবাক হওয়ার কিছু নেই। এরকম ঘটনাও পৃথিবীতে প্রতিদিন অনেক ঘটে।'

'কেন ছেড়ে গিয়েছিলেন তিনি ?'

'খুব সামান্য একটা কারণে। অবশ্য কারণটা আমার কাছে সামান্য, তার কাছে হয়তো অনেক বড় ছিল।' হায়াৎ রাস্তি সাহেব একটু থেমে বলেন, 'না থাক, আজ কথাটা শোনার দরকার নেই। অন্য একদিন বলব।'

চাঁদের দিকে আবার তাকান হায়াৎ রাস্তি সাহেব। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বলেন, 'আমি শিখাই নি, কিন্তু আমার ময়না পাখিটা ইদানীং আমাকে দেখলেই বলে ওঠে— মানুষ তুমি একা, মানুষ তুমি একা।' দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছাড়েন হায়াৎ রাস্তি সাহেব, 'মানুষ আসলেই একা, না ?'

শব্দ করে হাসছে নিপা। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে এরকম করে হাসতে থাকে ও। হাসতে হাসতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর কোনো কিছু আর মনে থাকে না ওর। দিব্যি সংসার শুরু করে— রুটি ভাজে, কখনো পরোটা ভাজে, সবজি রাঁধে, ডিম ওমলেট করে, চা বানায়, কফি বানায়।

ইদানীং একটা জিনিস খেয়াল করেছি আমি। নিপা কনসিভ করার পর থেকে মার্কেটে গেলেই আমাদের অনাগত সন্তানের এটা ওটা কিনতাম আমরা। সেই জিনিসগুলো ও ভেঙে ফেলে, ছিঁড়ে ফেলে, জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়। আমি এসব দেখি, কিন্তু কিছু বলি না। ওর যা মনে আসে, করুক, তাতে যদি ওর ভালো লাগে।

আজ একটু বেশি শব্দ করে হাসছে নিপা। হাসতে হাসতে ও একটা বালিশ হাতে নিয়ে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। ছোট বালিশ, এ রকম দুটো বালিশ আমরা আমাদের বাচ্চার জন্য কিনেছিলাম, একটা সবুজ রঙের, আরেকটা লাল। সবুজ বালিশটার তুলোগুলো বের করে ঘরের চারপাশে ছিটাতে ছিটাতে ও বলল, 'আজ আমি সারা রাত তুলা ছিটাব। প্রথমটার তুলা শেষ হলে দ্বিতীয়টারও ছিঁড়ব, ওটার তুলাও ছিটাব আমি। একটু পর আমার বাচ্চা আসবে দুধ খেতে, আমি ব্লাউজ খুলে কিন্তু ওকে দুধ খাওয়াব।'

চমকে উঠে আমি নিপার একটা হাত চেপে ধরে বলি, 'তুমি ঘুমাও নিপা, আমি তোমাকে চমৎকার একটা গল্প বলি।'

তুলা ছিটানো বাদ দিয়ে নিপা আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকায়, 'কিসের গল্প বলবে তুমি ?'

'কিসের গল্প শুনবে, বলো ?'

'একটা বাবুর গল্প বলো।'

'ঠিক আছে, তুমি শুয়ে পড়ো।'

লক্ষ্মী মেয়ের মতো শুয়ে পড়ে নিপা। অমি ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলি, 'লাল টুকটুকে খুব মিষ্টি একটা বাবু আসবে একদিন আমাদের ঘরে। এসে কী বলবে, জানো ?'

নিপা অস্ফুট স্বরে বলে, 'কী ?'

'বলবে— আম্মু, তুমি এত ভালো কেন বলো তো ? জানো।'

কথাটা শেষ করার আগেই নিপা আবার হাসতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে হাসে সে। হাসতে হাসতে ক্লান্ত হয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে আমিও ঘুমানোর চেষ্টা করি। কিন্তু বালিশে মাথা রাখার সঙ্গে সঙ্গে কথাটা শুনতে পাই আমি। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম প্রচণ্ড। কয়েক মাস আগে প্রথমবার যতটুকু চমকে উঠেছিলাম, তার চেয়ে বেশি। হায়াত রাস্তি সাহেব সেদিন চলে যাওয়ার পর গত নয়দিন কোনো সমস্যা হয় নি। আজ হঠাৎ করে বাচ্চাটা বলে উঠল, 'বাবা, যে যতকিছুই বলুক, তুমিই কিন্তু আমাকে মেরে ফেলেছ!'

'কে ?' লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসি আমি। অন্ধকার হাতড়ে লাইটটা জ্বালানোর আগেই বাচ্চাটা বলল, 'লাইটটা জ্বালিও না, বাবা।'

কিছুটা শব্দ করে আমি বলি, 'কে তুমি ?'

'আমি কে তা তো তুমি জানো, বাবা। আমি তোমার মেয়ে।'

'কী চাও তুমি আমার কাছে ?'

'কিছু না।'

'তাহলে আমার কাছে আসো কেন ?'

'এমনি। তোমাকে, আম্মুকে দেখতে আসি।'

'তুমি আর এসো না।'

'কেন বাবা ?'

'আমার খারাপ লাগে। তোমার জন্য তোমার মা কাঁদে। কিন্তু মনে হয় হাসে, ও আসলে কাঁদে।'

'আমি জানি বাবা।'

'তুমি আর সত্যি সত্যি এসো না।'

'ঠিক আছে বাবা আসব না। কিন্তু তোমার জন্য একটা জিনিস নিয়ে এসেছি আমি।'

'কী জিনিস ?'

'একটা ফুল নিয়ে এসেছি। অদ্ভুত রঙের, অদ্ভুত একটা ফুল বাবা, যা পৃথিবীর কোনো মানুষ দেখে নি।'

'ফুলটা কোথায় আছে ?'

'তুমি লাইটটা জ্বালালেই দেখতে পাবে। তোমার খাটের পাশে ছোট টেবিলটার ওপর আছে। আরো একটা জিনিস আছে সেখানে।'

'কী ?'

'তোমরা খুব শখ করে আমার জন্য দুটো সোনার চুড়ি বানিয়েছিলে। আম্মু আজ সেই চুড়ি দুটো বাইরে ফেলে দিয়েছিল। আমি সে দুটো কুড়িয়ে এনেছি। আগামীতে তোমাদের যে আরেকটা মেয়ে আসবে, তাকে দিও চুড়ি দুটো। বাবা, একটা অনুরোধ করব তোমাকে ?'

'বলো।'

'আমার তো হাত নেই। হাত থাকলে ফুলটা আমি নিজ হাতে তোমাকে দিতাম। আমি চলে যাওয়ার পর ফুলটা হাতে নিও কিন্তু। ফেলে দিও না, প্লিজ। আর আমি এখনই চলে যাচ্ছি। কখনো আর আসব না তোমাদেরে কাছে, বিরক্ত করব না আর তোমাদের। বাবা, তুমি কি জানো— ফুলটা আমি কেন এনেছি ?'

'কেন ?'

'আজ আমার জন্মদিন।'

ঝট করে লাইটটা জ্বালাই আমি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায় নিপার। পাশের টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা ফুল রয়েছে সেখানে, সোনার চুরি দুটোও। ওগুলো হাতে নিতেই নিপা বলল, 'এ ফুল আসল কোথা থেকে ? কী ফুল এটা ? আর এ চুড়ি দুটো কোথায় পেলে তুমি ? আমি তো এ দুটো ফেলে দিয়েছি।' নিপা হাসতে থাকে। ওর ব্লাউজের বোতাম দুটো খোলা, আমি বোতাম দুটো আটকাতে নেই, কিন্তু ও আমার হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দেয়। রাতের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে ও হাসতে থাকে।

অপূর্ব একটা সুবাসে ভরে গেছে আমাদের ঘরটা, অচেনা ফুলের অচেনা সুবাস। ফুলটার দিকে ভালো করে তাকাই আমি। কী আশ্চর্য, ফুলটা ভেজা— কাঁদছে যেন। একটু পর আরো এক ফোঁটা জল পড়ল সেই ফুলের ওপর, ফুলটা ভিজে গেল আরো। নিপা হাসছেই। ভেজা ভেজা ফুলের পাপড়িগুলোতে হাত রাখি আমি, পরম মমতায় পাপড়িগুলো আমার আঙুলগুলো জড়িয়ে ধরে, যেমন করে কোনো ছোট বাচ্চা জড়িয়ে তার বাবার হাত।

ফুলটা আরো ভিজে যাচ্ছে। আজ আমি সারারাত ফুলটাকে ভেজাব, চোখের জল শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভেজাব।

—

Pathfinder